হারিয়ে যাওয়া হায়দারাবাদ

আবদুল হাই শিকদার

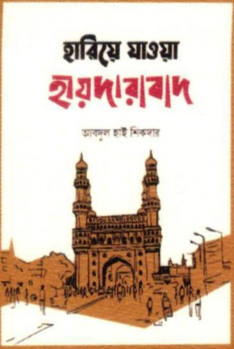

স্বাধীন হায়দারাবাদ আজ বিস্মৃতির এক নাম, বুভুক্ষু ভারতের গর্ভে রাতারাতি লীন হয়ে যাওয়া দুর্ভাগা রাষ্ট্র। মাত্র সাত দশকের ব্যবধানে তার সাক্ষ্য অপ্রতুল, বর্ণনা অনধিক, আর ন্যায্য সত্য ততোধিক সামান্য। আধিপত্যবাদী ভারতের মদতপুষ্ট বয়ানের নিচে চাপা পড়ে গেছে শান্ত স্বাধীন হায়দারাবাদের এক খণ্ড উদার আকাশ, অগণিত লাশের মিছিল, শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা চার মিনারের গৌরব। কেমন ছিল দখলপূর্ব হায়দারাবাদ? কী করে লুট হয়েছিল তার স্বপ্ন রক্ষার আজাদি? কারা ছিল সেই দখলাভিযানে বুনো ডাকুদের সরদার? এ গ্রন্থে এমন অজস্র অনিবার্য প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন আবদুল হাই শিকদার, ইতিহাসের অতল তলে ডুব দিয়ে তিনি ছেঁকে এনেছেন পরিত্যক্ত সত্যের ভগ্নাবশেষ। এক অন্তর্লীন প্রত্যয়ে তিনি ক্রমশ ধেয়ে গেছেন অতীতের অভিমুখে, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও নথিপত্রের ক্ষুরধার বর্ষায় এফোঁড়-ওফোঁড় বিদ্ধ করেছেন মহাভারতের তথাকথিত মহা-আখ্যান।

আবদুল হাই শিকদার

বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক। জন্ম ১৯৫৭ সালের ০১ জানুয়ারি, কুড়িগ্রামের দুধকুমার নদীর তীরে দক্ষিণ ছাট গোপালপুর গ্রামে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৭৯ সালে বাংলায় স্নাতক, এরপর দীর্ঘ বিরতি শেষে শান্ত মরিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৬ সালে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর সমাপ্ত করেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রায় সকল অঙ্গনে স্বতন্ত্র কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেও অন্দরে তিনি নিঃসংশয় ও নিঃসংকোচের কবি, ধ্বনির দুর্ভেদ্য শিকারি। সাম্য, মানবতা, মুক্তি ও স্বদেশ চেতনা তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব ও স্বজাতির মুক্তির প্রশ্নে তিনি আগাগোড়া আপসহীন। দীর্ঘ চার দশক নিরলস কাজ করেছেন প্রথম সারির একাধিক গণমাধ্যমে, ছিলেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের টানা দুই টার্মের নির্বাচিত সভাপতি। এ ছাড়া কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত। এযাবৎ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা -১২০এর অধিক, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

কাব্যগ্রন্থ

আশি লক্ষ ভোর (১৯৮৭)
আগুন আমার ভাই (১৯৯১)
রেলিঙ ধরা নদী (১৯৯২)
এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো (১৯৯৭)

প্রবন্ধগ্রন্থ

জানা অজানা মওলানা ভাসানী (২০০১)
বাংলা সাহিত্যে : নক্ষত্রের নায়কেরা (২০০৩)
ঢাকার ভবিষ্যৎ : বাংলাদেশের শত্রুভাগ্য (২০০৮)
হারিয়ে যাওয়া হায়দারাবাদ (২০১৩)

গল্পগ্রন্থ

শুকুর মামুদের চুয়াত্তর ঘাট (২০02)
শিশুতোষ সাহিত্য
গান পাখিদের দিন (২০০১)
দাদীর বনের গাছ বিরিক্ষি (২০০৫)

পুরস্কার ও সম্মাননা

গ্লাসগো বেঙ্গলি পারফরমিং আর্টস সম্মাননা (১৯৯৫)
বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০০৩)
জাতীয় প্রেস ক্লাব সম্মাননা (২০০৩

হারিয়ে যাওয়া হায়দারাবাদ

আবদুল হাই শিকদার

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

https://nagorikpathagar.org

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা—১১০০
০২-৫৭১৬৩২১৪, ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

প্রথম প্রকাশ	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	আবদুর রহমান রাফি
আইএসবিএন	৯৭৮-৯৮৪-৯৮৯০০-৮-৯
ফিক্সড প্রাইস	২৪০ টাকা

https://nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

অ্যাডভোকেট আদিলুর রহমান খান
মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য
যিনি নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন।

https://nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস তো ইতিহাসই। আজকের সময়ের ঘটনাপ্রবাহই আগামী দিনের ইতিহাস। আমরা ইতিহাসচর্চা করি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে। একই সাথে কিছু কিছু ইতিহাসকে সময়ের বাক্স থেকে হারিয়ে দেওয়া হয় পরিকল্পিতভাবে। অতীতে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, সচেতনভাবে তা ইতিহাসের চোরাবালিতে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু শেকড়সন্ধানী চোখের সামনে চাইলেই তো সবকিছু লুকিয়ে রাখা যায় না, সময়ের গহ্বর থেকে ঠিকই বের করে আনে সত্যের নির্যাস। *হারিয়ে যাওয়া হায়দারাবাদ* ঠিক সে রকমই এক সত্য উন্মোচন। ইতিহাসের পাতা থেকে জোরপূর্বক মুছে ফেলা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে স্বাধীন হায়দারাবাদ এক উপেক্ষিত ও অনালোচিত অধ্যায়, আধিপত্যবাদী ভারতের চক্রান্ত ও জিঘাংসার কালগ্রাসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যার স্বাধীন অস্তিত্ব। আজ থেকে ৭৬ বছর আগে ১৯৪৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ভারত পরিচালিত সাম্প্রদায়িক সংঘাত, বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী তৎপরতা, ধারাবাহিক কূটকৌশল ও অন্যায্য সেনা অভিযানের মুখে শেষবারের মতো ডুবে গিয়েছিল স্বাধীন হায়দারাবাদের সূর্য!

৪৭-এর পার্টিশনে ভারত ও পাকিস্তানের সাথেই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল হায়দারাবাদ। নিজাম ছিলেন দেশটির সর্বোচ্চ পদাধিকারী। অন্যান্য স্বাধীন দেশের মতো হায়দারাবাদেরও ছিল নিজস্ব মুদ্রা, পতাকা, সেনাবাহিনী, সিয়াসত ও সংস্কৃতি। কিন্তু নিজের নাকের ডগায় পাকিস্তানের পাশে মুসলিম শাসিত আরও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবে নেয়নি উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারত। হায়দারাবাদ অচিরেই ভারতের জন্য হুমকি হয়ে পড়ে কোনো কারণ ছাড়াই। শান্তি ও নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ দেশটি ঝাঁপিয়ে পড়ে হায়দারাবাদের বুকে। মেতে ওঠে আকস্মিক জবরদখল ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞে। ইতিহাসের অসীম অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া সেই হায়দারাবাদ আজ পুনরুদ্ধার অসম্ভব, কিন্তু তাকে চেনা ও জানা অসম্ভব নয় মোটেই। সময়ের সেই জরুরি প্রয়াসে অনেকটা এগিয়ে দেবে আবদুল হাই শিকদারের অনন্য সৃষ্টি *হারিয়ে যাওয়া হায়দারাবাদ*।

https://nagorikpathagar.org

গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স-এর কাঁধে ন্যস্ত করায় লেখক আবদুল হাই শিকদারের প্রতি অতল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আশা করি, পাঠক এই গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে আধিপত্যবাদী ভারতের স্বভাবসুলভ আগ্রাসী চরিত্রের হদিস পাবে; দেখতে পাবে 'মেরা ভারত মহান' স্লোগানের অন্তরালে ঘাপটি মেরে থাকা এক সাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের আসল চেহারা।

নূর মোহাম্মদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা।
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

https://nagorikpathagar.org

গার্ডিয়ান সংস্করণ প্রসঙ্গে লেখকের কথা

অতীতের যেকোনো সময়ের চাইতে ভয়ংকর এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে আজ বাংলাদেশ। বিপন্ন বিস্ময়ে স্তম্ভিত তার সামগ্রিক অস্তিত্ব। হিংস্র নেকড়ের সামনে অসহায় মেষশাবকের মতো কম্পমান তার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব। সে কারণে হায়দারাবাদ ট্রাজেডি থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই প্রথম প্রকাশের উনিশ বছর পর আবার *হারিয়ে যাওয়া হায়দারাবাদ*-কে সামনে নিয়ে এসেছে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স।

২০১৩ সালের প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে *হারিয়ে যাওয়া হায়দারাবাদ* অর্জন করেছিল বিপুল পাঠকপ্রিয়তা। তার পর নিশ্চয়ই আরও কয়েকটি সংস্করণ বেরিয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার কাছে আছে শুধু প্রথম সংস্করণের তথ্যটুকু। পরবর্তী সংস্করণগুলোর ব্যাপারে আমি আজও আছি ঘন কুয়াশায়।

সেই দুর্যোগ এখন আর নেই। গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স সকল নিয়মনীতি মেনেই বইটিকে নিয়ে এসেছে পাঠকের আলোকিত পড়ার টেবিলে। দেশকে যারা ভালোবাসে, সেইসব মানুষের পক্ষ থেকে গার্ডিয়ানকে জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ আবার অনুজতুল্য সম্পাদক ফয়সাল আহমেদকে। লেখক ও প্রকাশকের মধ্যকার প্রীতির বন্ধনটুকু তো তারই প্রয়াসের ফজিলত।

আবদুল হাই শিকদার
জাতীয় প্রেসক্লাব
ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

https://nagorikpathagar.org

মুখবন্ধ

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ভারত ও পাকিস্তানের সাথেই স্বাধীনতা অর্জন করে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে পরিণত হয় হায়দারাবাদ। লাভ করে জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি। কিন্তু হায়দারাবাদের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে ওঠে দুর্যোগের মেঘ। দেশটির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারছিল না ভারত। ফলে হায়দারাবাদকে গ্রাস করার জন্য 'নেহেরু ডকট্রিন'-কে সামনে নিয়ে বিস্তার করতে থাকে ষড়যন্ত্রের জাল। হায়দারাবাদের দেশপ্রেমিক জনতা তাদের সেসব চক্রান্তের মোকাবিলা করতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ ভারত স্বাধীনতা লাভের মাত্র ১ বছর ২৯ দিন পর ১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর 'অপারেশন পলো' নামে পুলিশ অ্যাকশনের আড়ালে বিশাল সামরিক বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হায়দারাবাদের ওপর। পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে ভারতীয় বাহিনী শহর-বন্দর-গ্রাম ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকে রাজধানীর দিকে। মরণপণ লড়াই করেও বিশাল ভারতীয় বাহিনীর কাছে ১৮ সেপ্টেম্বর পরাজিত হয় হায়দারাবাদ। ভারতীয় বাহিনী মেতে ওঠে নারকীয় গণহত্যায়। লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারায় ভারতীয় বাহিনীর হাতে। ধর্ষিত হয় লক্ষাধিক নারী। খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠনের মাধ্যমে হায়দারাবাদকে বিভীষিকার মধ্যে নিক্ষেপ করে উত্তোলিত হয় ভারতীয় পতাকা। ভারত অতি দ্রুত হায়দারাবাদকে খণ্ডবিখণ্ড করে মিশিয়ে দেয় তার বিভিন্ন রাজ্যের সাথে। বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে যায় হায়দারাবাদের অস্তিত্ব। এখন হায়দারাবাদ বলতে টিকে আছে শুধু একটি শহর।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্ম ইতিহাসের এই ভয়ানক ঘটনা সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানে না। ভারতীয় আধিপত্য ও সম্প্রসারণবাদ সম্পর্কে তাদের ধারণা বড়োজোর সিকিম পর্যন্ত। ফলে ভারতের ছদ্মবেশী অহিংসার বাণীর ভেতরে তারা কোনো দোষ খুঁজে পায় না। এই অভাব থেকেই হায়দারাবাদ ট্রাজেডিকে সামনে নিয়ে আসা। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে হায়দারাবাদ

https://nagorikpathagar.org

ট্রাজেডি থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্ণিল ও নানামাত্রিক ষড়যন্ত্র, প্রলোভনের হাতছানি এড়িয়ে নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আরেকটু সচেষ্ট হয়, তারও একটা আকুতি মিশে আছে এই গ্রন্থের অন্তরে।

এই গ্রন্থের সবগুলো পর্বই ২৯ জানুয়ারি, ২০১২ থেকে ৩ জুন, ২০১২ তারিখের মধ্যে *দৈনিক আমার দেশ*-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেন দুঃসময়ের সাহসী মানুষ, কারা নির্যাতিত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। তার কাছে আমার অশেষ ঋণ। *আমার দেশ*-এর সহকর্মীদের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। প্রকাশের পর থেকেই বই আকারে বের করার তাগাদা দিচ্ছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। তাদের আগ্রহও গ্রন্থাকারে প্রকাশের অন্যতম কারণ।

এই বই লিখতে গিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে দু-হাত ভরে তথ্য নিয়েছি। কিছু অংশ পরিশিষ্টে যুক্ত করেছি। সাবেক প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও খ্যাতিমান অনুবাদক আবু জাফর এবং সিকদার আবুল কাশেম শামসুদ্দিন কয়েকটি মূল গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ইংরেজি অংশগুলো অনুবাদ করে দিয়েছে আমার আত্মজ পরম ওয়াজেদ শিকদার। আমার অনুজতুল্য হাসনাইন ইকবালও দৌড়ঝাঁপ করেছে বিস্তর। প্রকাশক মিজানুর রহমান সরদার (মিলন)-তো আছেই আমার পাশে। এদের ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করি কোন মুখে।

আবদুল হাই শিকদার
১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

https://nagorikpathagar.org

চোখের পাপড়িগুলো পর্যন্ত বরফ-সাদা। আর অবিরল তুষারপাতের ভেতর দিয়ে টিউব রেলওয়ে হয়ে পায়ে হেঁটে আমি এসেছি। পেঁজা তুলার মতো জমাট তুষার এখানে-ওখানে। গাছের পাতায়। ট্রাফিক সিগন্যালের মাথায়। ফুটপাথে। পুরো ওভারকোটে মোড়ানো আমার শরীর দেখে যে কারও মনে হতেই পারত, 'এ মুভিং প্যাকেট অভ গুডস'। আমার সে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, স্তূপ স্তূপ বরফ আমার পায়ের নিচে বিছিয়ে রেখেছে রাজ্যের শুভ্রতা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের দাঁতের চেয়েও সে শুভ্রতা নিষ্ঠুর এবং একই রকম শীতল। আমার জুতার তলা দিয়ে ঠান্ডা ঢুকতে থাকে। অনুভব করি কনকনে বাতাস বরফাচ্ছন্নতাকে আরও উসকে দিয়ে কাঁপন ধরাতে এগিয়ে আসছে আমার রক্তে। সঙ্গী নাইমুল হক সেই সময় কড়া নাড়ে আকাঙ্ক্ষিত দরজায়। ১৯৯৫ সালের শীতে বিকালের লন্ডন দরজা খুলেই হাত বাড়ায়, 'আহলান সাহলান, খোশ আমদিদ।'

ভদ্রলোকের মাথার চুলগুলো লন্ডনের বরফের চাইতেও সাদা। মুখভর্তি তারও চেয়ে সাদা সুবিন্যস্ত দাড়ি। পরনের পোশাকে এখনও লেগে আছে ওরিয়েন্টাল আভিজাত্যের ঘ্রাণ। দুধের সঙ্গে আলতা মেশানো গায়ের রং। হাত যখন বাড়ালেন আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। হাতের প্রতিটি পশমে পর্যন্ত শ্বেত সৌন্দর্যের কারুকাজ। পুরুষ্টু হাতটি আমি হাতের মধ্যে নিলাম। তিনি আমাকে ভেজা ওভারকোটসহই জড়িয়ে নিলেন বুকে, 'ভাই সাহেব, কতদিন পরে আমার তরুণ ভাই খোঁজ নিতে এসেছে এই বদনসিবের।'

বললাম, বদনসিব হবেন কেন? তাসাদ্দুক ভাই আপনার সম্পর্কে আমাকে যা বলে দিয়েছেন, তা থেকে আমার ধারণা হয়েছে, আপনি এক অসাধারণ মানুষ। আর তাসাদ্দুক ভাইয়ের মতো লোক তো যে কারও সম্পর্কে যা খুশি তা বলতে পারেন না।

স্মিত হেসে আমাকে হাত ধরে ড্রয়িংরুমে নিয়ে তাজিমের সঙ্গে বসালেন। বাইরের ঠান্ডা রুমের উষ্ণতায় দ্রুত কেটে যাচ্ছে টের পাচ্ছি। এর মধ্যে কফি

https://nagorikpathagar.org

চলে এলো। গরম কফিতে চুমুক দিতে দিতে তাসাদ্দুক ভাই, মানে সেই সময়কার লন্ডনে বাংলাদেশিদের সব অগতির গতি তাসাদ্দুক আহমদের কথা ভাবছিলাম। তিনি আমাকে এই মানুষটির কাছে পাঠিয়ে বললেন, সৈয়দ কুতুবউদ্দিন সাহেব লন্ডনে এসেছেন সেই ১৯৪৯ সালে। তুমি তো ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো। তার কাছে উপমহাদেশের ইতিহাসের বেশ কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়ে গেছে। একটা স্বাধীন দেশকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার জীবন্ত সাক্ষী তিনি। জানাশোনা লোক। একসময় লেখালিখি করতেন, এখন করেন না। বলেন, 'এ জীবনে তো আর মাতৃভূমির স্বাধীনতা উদ্ধার করতে পারলাম না। এখন তো জীবনে লেগেছে ভাটার টান। আর পেছনে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে না। এখন চিরতরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।' তবুও তুমি তার কাছে যাও। স্বাধীন হায়দারাবাদ কীভাবে ছয় দিনের যুদ্ধে ভারত দখল করে নিয়েছিল, তার বিস্তারিত কথা শুনতে পাবে তার কাছে।

তাসাদ্দুক ভাইয়ের নির্দেশ মানতে এবং আমার অন্তরের আগ্রহ পূরণ করতেই এই শীতের বরফ ঠেলে এখানে আসা।

কফির কাপ টেবিলে রাখতে রাখতে বললাম, আপনার কথা বলুন। আপনার দেশের কথা বলুন। কুতুবউদ্দিন সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, আমার নিজের কোনো কথা নেই। আর আমার কোনো দেশ নেই। আমি হলাম দেশহীন এক মানুষ। ১৯৪৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর আমার দেশ দখল করে নিয়েছে ভারত।

বললাম, সেই হায়দারাবাদের কথাই বলুন। সৈয়দ কুতুবউদ্দিন বিখ্যাত উর্দু কবি দাগের গজল শোনালেন আমাদের :

দিল্লি সে চলে দাগ, করো সায়র ডেকান কি,
গওহর কি হুয়ি কদর, সমুন্দর সে নিকাল কে।
হায়দারাবাদ রহে তা-বা, কেয়ামত কায়েম
এহি, অ্যায় দাগ, মুসলমান কি এক বসতি হ্যায়।

[হে দাগ, দিল্লি ছাড়। দাক্ষিণাত্যের পথে ভ্রমণ কর। মুক্তার দাম তো তখনই হয়, যখন সে সমুদ্রের বাইরে আসতে পারে। হায়দারাবাদ কিয়ামত পর্যন্ত উজ্জ্বল থাক, চিরজীব হোক; কারণ এই তো একমাত্র স্থান, যেখানে মুসলমানরা বাস করতে পারে।]

কবি দাগের সেই শুভকামনা পূর্ণ হয়নি। পূর্ণ হতে দেওয়া হয়নি। স্বাধীন হায়দারাবাদ বেঁচে থাকেনি। বেঁচে থাকতে পারেনি। বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়নি।

https://nagorikpathagar.org

মুসলমানদের আবাসস্থল হয়েও সে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। দাগের কবিতা লেখার ৫০ বছরের মধ্যে হায়দারাবাদ ভারতীয় আধিপত্যবাদের শিকারে পরিণত হয়ে রাষ্ট্র হিসেবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বিশ্বমানচিত্র থেকে মুছে গেছে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের নামনিশানা। ভারতীয় বাহিনী হায়দারাবাদ দখলের পর প্রথমেই ভেঙে দিয়েছিল এর সেনাবাহিনী। সব দেশপ্রেমিককে করেছিল শৃঙ্খলিত। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল উর্দুকে। নিষিদ্ধ হয়েছিল জাতীয় সংগীত। এভাবে রাষ্ট্র হিসেবে হায়দারাবাদের বিলুপ্তির ঘোষণা করে ভাষার ভিত্তিতে একে তিন টুকরো করা হলো। এক টুকরো দেওয়া হলো অন্ধ্রকে, এক টুকরো মহারাষ্ট্রের সঙ্গে, অন্য টুকরো বিলীন করে দেওয়া হলো মহিশুরের সঙ্গে। আমার দেশ হায়দারাবাদ রাষ্ট্রের শেষ ও একমাত্র চিহ্ন হিসেবে টিকে রইল শুধু শহর হায়দারাবাদ।

সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের চোখ চলে যায় সুদূর অতীতে। তার ফেলে আসা যৌবনে। তার হায়দারাবাদে। তার শৈশব, তার কৈশোরে। নিজের ফেলে আসা গৃহের আঙিনায়। হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে নিমিষে তার হৃদয় লন্ডন থেকে চলে যায় হারিয়ে যাওয়া হায়দারাবাদে। টানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার কথা বলতে শুরু করেন, আমি কি বেশি কথা বলছি?

বললাম, ঠিক আছে, আপনি বলুন।

তিনি বললেন, কী করব, আমি ছাড়া আজকের পৃথিবীতে বিলুপ্ত হায়দারাবাদের জন্য কথা বলার লোক, চোখের পানি ফেলার লোক হয়তো আর নেই।

অনেকক্ষণ চুপ থেকে আবার বলতে শুরু করেন সৈয়দ কুতুবউদ্দিন—

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮। আমাদের স্বাধীনতা লাভের মাত্র এক বছর তিন মাসের মাথায়। তখন আমি মাত্র ৩১ বছরের যুবক। সদ্য বিয়ে করেছি মাতৃভূমির গৌরবে গৌরবান্বিত বুক নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে দেশের জন্য কাজ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি কর্মক্ষেত্রে। অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হায়দারাবাদে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। হায়দারাবাদে কেউ কখনো না খেয়ে মরেনি। শিক্ষার হার ছিল উপমহাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। সর্বত্র শান্তি আর সদ্য স্বাধীনতা লাভের আনন্দ। সেই সময় যখন আমরা কেবল ঘর গোছাচ্ছিলাম, দেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করছিলাম, যখন কেবল মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছি। আমার সদ্য বিয়ে করা বিদুষী স্ত্রী বলত, সারাক্ষণ দেশ দেশ করে বাইরে থাকো। এবার ঘরের দিকে একটু মন দাও।

https://nagorikpathagar.org

বলতাম, ঘরকে সুন্দর করার জন্যই দেশকে সুন্দর করার কাজে মন দিয়েছি। তোমাকে, তোমার ঘরকে ভালোবাসি বলেই তো দেশকে ভালোবাসি।

স্ত্রী প্রসঙ্গ আসাতে বিমর্ষ হয়ে গেলেন কুতুবউদ্দিন সাহেব। ৭৮ বছরের প্রবীণ চোখে কি পানি এলো? আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই কায়দা করে চোখ মুছে নিলেন বৃদ্ধ।

বলে চললেন, সেই সময় ১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো পৃথিবীর সব নীতি-নিয়ম, জাতিসংঘের সনদ দু-পায়ে মাড়িয়ে হিংস্র হায়েনার মতো চারদিক থেকে হায়দারাবাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারতীয় সেনাবাহিনী। শত শত ট্যাংক, কামানের গর্জনে প্রকম্পিত হলো হায়দারাবাদের আকাশ-বাতাস-জমিন। ভারতের বোমারু বিমানগুলোর নির্বিচার বোমাবর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হলো ৫ শ বছর ধরে গড়ে ওঠা সুন্দর দেশ হায়দারাবাদ।

উন্মত্তের মতো মুসলিম হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠল ভারতীয় সেনাবাহিনী। কারণ, তারাই ছিল হায়দারাবাদের স্বাধীনতা রক্ষার মূল চালিকাশক্তি। শহর, বন্দর, বাজার, গ্রাম, গঞ্জ ধ্বংস করে মাইলের পর মাইল বাড়িঘর, মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে রাজধানীর দিকে এগোতে থাকল ভারতীয় বাহিনী। প্রথম দুই দিনেই ৭০ হাজারের মতো নিরীহ সাধারণ মানুষ নিহত হলো ভারতীয় সৈন্যদের হাতে। ধর্ষিত হলো ৩০ হাজারের মতো মা-বোন। মানবসভ্যতার এত বড়ো বিপর্যয়ের মুখেও সেদিন মুখে কুলুপ এঁটে নীরব-নিঃশব্দ হয়ে বসে রইল বিশ্ববিবেক।

এমনকি মুসলিম দেশগুলো পর্যন্ত সেদিন সাহায্য তো দূরের কথা, এই ভয়াবহ আগ্রাসানের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। এই নীরবতা, এই নিঃসঙ্গতা, এই জঘন্য উদাসীনতার কারণ কী ছিল, জাতিসংঘই-বা কেন সেদিন নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন ডাকতে বিলম্ব করল—তা আজও রহস্যাবৃতই হয়ে আছে। জাতিসংঘসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের কথা না হয় বাদই দিলাম, মুসলিম দেশগুলো কেন হায়দারাবাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, তা আজও কারও বোধগম্য নয়।

কিন্তু আমরা, আমার মতো লাখ লাখ স্বাধীনতাপিপাসু মানুষ, সেদিন আমাদের যার কাছে যা ছিল তা-ই নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম ভারতীয় হানাদারদের বিরুদ্ধে। হায়দারাবাদের গণমানুষের প্রিয় নেতা কাশেম রিজভী বিপন্ন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গড়ে তুলেছিলেন প্রবল প্রতিরোধ। কিন্তু অত্যাধুনিক

https://nagorikpathagar.org

অস্ত্রে সজ্জিত লক্ষাধিক সৈন্যের একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় নিরস্ত্র জনতা যুদ্ধ করে টিকে থাকতে পারে কদিন?

ভারতের তল্পিবহনকারী, দালাল, সুবিধাভোগী, দেশদ্রোহীচক্র যারা নানা ছদ্মাবরণে হায়দারাবাদের জাতীয় ঐক্য, সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও নিজস্ব সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্য কাজ করছিল; তারা এবার প্রকাশ্যে এসে হাত মেলাল ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে।

হায়দারাবাদের রাজনীতিবিদ, সমরনায়ক, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ীদের বিরাট অংশ জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামকে ভেতর থেকে ভয়ানক দুর্বল করে তুললেন। গোটা জাতিকে নানা কায়দায় পরিষ্কার দুটো ভাগে বিভক্ত করে তুলল। নানা কল্পকাহিনির জন্ম দিলো তারা। ভারতীয় পত্রপত্রিকা এক্ষেত্রে জোগালো ঢালাও সমর্থন।

ফলে আঘাত ও আগ্রাসন যখন প্রত্যক্ষভাবে এলো, তখন দ্বিধাবিভক্ত জাতির পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। এরই মধ্যে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আল ইদরুস করলেন চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ঠিক আপনাদের মীরজাফর যেভাবে সিরাজের সঙ্গে, মীর সাদেক যেভাবে টিপু সুলতানের সঙ্গে করেছিলেন।

তো আমাদের সব উদ্যোগ আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল। ফলে মাত্র ছয় দিনের যুদ্ধে ১৮ সেপ্টেম্বর পতন হলো হায়দারাবাদের। মুছে গেল হায়দারাবাদ। আহ—!

বুকে চেপে রাখা একটা কষ্ট যেন গলা দিয়ে গোঙারানির মতো বেরিয়ে এলো কুতুবউদ্দিন সাহেবের। কথা বলা বন্ধ করে বাইরে তুষারপাত দেখার দিকে যেন মন দিলেন হঠাৎ। আমরা কেউ কোনো কথা বলি না। আবার শুরু করেন বৃদ্ধ—

‘যুদ্ধের ময়দানে গুলিবিদ্ধ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেখান থেকে কীভাবে কোথায় গিয়েছি, বলতে পারব না। আমার জ্ঞান ফিরল পরাধীন হায়দারাবাদে ওসমানিয়া হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে আমাকে পাঠানো হলো জেলে। জেলের ঘানি টানলাম কয়েক মাস। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হলো গোলযোগ সৃষ্টির। ভারতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অভিযোগ এলো। অভিযোগ এলো রাষ্ট্রদ্রোহিতার! কয়েকজন ভারতীয় সৈনিক নাকি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার গুলিতে মরেছিল।

সেই মামলা-হামলা পার হয়ে জামিন জুটল এরও ছয় মাস পর। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে দেখি, সর্বত্র পতপত করে উড়ছে ভারতীয় পতাকা। ছারখার হয়ে গেছে হায়দারাবাদ। হায়দারাবাদ যেন ধ্বংসস্তূপ হয়ে আছে। বেহুঁশের মতো ছুটলাম নিজ বাড়িতে।

https://nagorikpathagar.org

আমাদের পুরো মহল্লাটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পড়ে আছে ছাইভস্ম আর পোড়ামাটি। আমার বাবা-মা, দুটি ভাই—কারোই কোনো খোঁজ পেলাম না। হয়তো বন্ধ ঘরে আটকে তাদের আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় বাহিনী। হঠাৎ আমার স্ত্রী, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী—যে একজন ভালো আইনজীবী হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তাকে খুঁজলাম। আমার এক সদাশয় স্নেহময় হিন্দু প্রতিবেশী বৃদ্ধ বললেন, "বাবা রে, সব তো শেষ হয়ে গেছে। ওরা এখানকার সহায়সম্পদ সব লুণ্ঠন করেছে। মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে। তবে মহল্লায় ঢুকে মেয়েদের, বিশেষ করে যুবতি মেয়েদের ওরা আগেই আলাদা করে ট্রাকে উঠিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে গেছে। এর বেশি আমি কিছু জানি না।" তার পরের কয়েক মাস আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে, জীবনের ভয়কে তুচ্ছ করে আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে বেরিয়েছি আমার বাবা-মা, ভাই ও জেবুন্নেসা—আমার স্ত্রীকে। হাসপাতাল, মর্গ, জেলখানা, পতিতাপল্লি—কোথাও বাদ দিইনি। আমার কয়েকজন হিন্দু বন্ধুর সহযোগিতায় ভারতীয় সৈন্যদের শিবিরেও খোঁজ নিয়েছি। কাউকেই পাইনি। আমি আর ওকেও খুঁজে পাইনি। ওর কী হয়েছিল, তাও কোনো দিন জানতে পারিনি। আমার মতো এ রকম হাজার হাজার স্বামী তাদের স্ত্রীদের, বাবা তাদের ছেলেমেয়েদের খুঁজে পায়নি। হয়তো হায়দারাবাদের কোনো চিহ্নহীন গণকবরে চাপা পড়ে গেছে আমার জেবুন্নেসা, আমার বাবা-মা-ভাই। তারপর আর কী—

ওহ্ দিল্ নহি রহা হ্যায়, নহ্ ওহ্ আর নিমাগ হ্যায়,
জি এনমেঁ আপনে বুঝতাসা কোই চিরাগ হ্যায়।

[সেই হৃদয় নেই, সেই মাথাও এখন নেই। শরীরে প্রাণ আছে, কিন্তু সে যেন এক নিভু নিভু দীপ।]

কথা বলতে বলতেই আমাদের দিকে চোখ ফেরালেন সৈয়দ কুতুবউদ্দিন। তার মুখের দিকে তাকাতে ভয় করছিল আমার। না জানি কী সেখানে দেখব। তবুও কথা শেষ হয় না তার—

'শিকদার সাহেব, আপনাদের বাংলাদেশের তুলনায় আয়তনে অনেক বড়ো দেশ ছিল আমার হায়দারাবাদ। শুধু আয়তনের দিক থেকেই নয়; সম্পদ, সমৃদ্ধি, সামর্থ্যের দিক থেকেও স্বাধীন রাষ্ট্র হায়দারাবাদের সম্মান ছিল অনেক উঁচুতে। হায়দারাবাদের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ছিল। নিজস্ব মুদ্রাব্যবস্থা ছিল। সেনাবাহিনী ছিল। আইন, আদালত, বিচারব্যবস্থা ছিল। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, শুল্ক বিভাগ ছিল। নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় ও ভাষা ছিল। নিজস্ব পতাকা ছিল। জাতীয় সংগীত ছিল। পৃথিবীর দেশে দেশে নিজস্ব রাষ্ট্রদূত ছিল।

https://nagorikpathagar.org

জাতিসংঘে নিজস্ব প্রতিনিধি ছিল। সব ভারতের আগ্রাসী তাণ্ডবে মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে গেল।

নিঃস্ব, রিক্ত, দুঃখী, পরাধীন হায়দারাবাদে আর থাকব না বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। তারপর কিছু বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে ভারত-অধিকৃত হায়দারাবাদ থেকে রাতের অন্ধকারে পালালাম। তার পর নানা ঘাটে দোল খেতে খেতে এলাম লন্ডনে। সেই যে এলাম...!'

সৈয়দ কুতুব উদ্দিন আবার থামেন। এরই মধ্যে রাতের খাবারের ডাক আসে। আমি ও নাইমুল একসঙ্গে সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের দিকে তাকাই। বুকে হাত বোলাতে বোলাতে আবার কথা শুরু করেন—

'আমার এই বুকের ভেতরে অনেক জ্বালা, অনেক কষ্ট, অনেক স্বজন হারানোর কান্না। এগুলো আমার মধ্যে সারাক্ষণ দগদগে ঘায়ের মতো জ্বলতে থাকে। আমি ঘুমুতে পারি না বহুদিন। কাউকে যে বলে একটু হালকা হব, সে উপায়ও নেই। দরদি মানুষ কোথায়? ৭৮ বছর বয়সে এসেও আমি আজও ভুলতে পারিনি জেবুন্নেসার সেই শেষ বিদায়ের মুখটা। আমাকে বলেছিল, "তোমাকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিলাম। বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো।" আমি বিজয়ী হতে পারিনি বলেই হয়তো ভারতীয় সৈনিকরা আমার জেবুন্নেসাকে শিয়াল-শকুনের মতো কামড়ে কামড়ে খেয়েছে!'

লন্ডনের তুষারপাতের মধ্যে এবার নেমে আসে অঝোর শ্রাবণ। বৃদ্ধের দুই চোখ দিয়ে বহুদিন পরে যেন উপচিয়ে নেমে আসে অবিরল পানির ধারা। রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠস্বর। তবুও ভাঙা গলায় আবৃত্তি করতে থাকেন মীর তকী মীরের গজল—

> হু শমা—এ আখিরে শব্, শুন সরগুজশত মেরী,
> ফির শুব্‌হ হোনে তকতো কিসসা হি মুখতসর হ্যায়।

[শেষ রাতের প্রদীপ আমি, শুনে নাও আমার দুঃখের কাহিনি, ভোর হতে হতে তো সবই শেষ হয়ে যাবে।]'

https://nagorikpathagar.org

হারিয়ে যাওয়া হায়দারাবাদের 'দেশহীন মানুষ' সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ১৯৯৫-এ। এরপর একে একে কেটে গেছে ১৭টি বছর। এই এতগুলো বছরেও আমি ভুলতে পারিনি সেই শোকজর্জর ব্যথিত স্বজনহারা বৃদ্ধের অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি। তার দুটি চোখের মধ্যে যে সর্বস্বহারা হাহাকার, স্বাধীনতা হারানোর যে কষ্ট আমি দেখেছিলাম, আজ এতগুলো বছর পর সেই কষ্টের অনুরণন আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ভেতরে। আমার স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে আর্তরক্তাক্ত একটি অ্যাম্বুলেন্স যেন গত কিছুদিন থেকে ছুটে বেড়াচ্ছে। যেন কোথাও কোনো সাইরেন আমার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে আতঙ্ক, ভীতি ও সন্ত্রাস। একটা অশনিসংকেত। সে ভয় গত কয়েক দিনে আমাদের স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা গওহর রিজভী এবং মশিউর রহমানদের কথায় আরও বেড়ে গেছে। বাংলাদেশকে আমাদের শাসকরা কি হায়দারাবাদের মতো পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে? আমাদের লাখ লাখ শহীদের রক্তভেজা জাতীয় পতাকাকে আমরা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীদের হাত থেকে বাঁচাতে পারব তো? বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা যে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন, সে সম্পর্কে জনগণ সচেতন কতটুকু? নাকি ১৭৫৭ সালের ২৩ জুনের পলাশি যুদ্ধের সময়কার পরিস্থিতি চারদিকে? বাংলাদেশের স্বাধীনতা ষড়যন্ত্রকারীরা তুলে দিচ্ছে বিদেশিদের হাতে, আর বাংলাদেশের মানুষ ব্যস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কাজ নিয়ে। পলাশির পাশের মাঠে কৃষক হাল দিচ্ছে জমিতে, বটতলায় বসে গুরু মহাশয় জ্ঞান দিচ্ছেন টোলের ছাত্রদের।

আমাদের দেশের লোকজন বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম সিকিমের কথা কিছু জানলেও হায়দারাবাদের প্রসঙ্গ তাদের অজানাই। এই বিষয়ে জানানোর কোনো উদ্যোগও যেমন কেউ কোনো দিন নেয়নি, তেমনি জানার পথও খুব সংকীর্ণ। অথচ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সিকিমের চেয়েও বেশি মিল হায়দারাবাদের। ১৯৪৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ভারতীয় আগ্রাসী হানাদার বাহিনীর হাতে পতনের আগে হায়দারাবাদের রাজনীতিবিদ, আমলা, সমরনায়ক,

https://nagorikpathagar.org

ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যা যা করেছিল, তার অনেক কিছুর সঙ্গে আমাদের মিল দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই।

সেজন্যই আমার সব সময় মনে হয়েছে হায়দারাবাদ হারিয়ে যাওয়া কোনো অতীত নয়, মুছে ফেলা কোনো দেওয়ালের লিখন নয়। ফেলে দেওয়া কোনো ক্যালেন্ডারের পাতা নয়। হায়দারাবাদ আমাদের জন্য জীবন্ত ইশতেহার, ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা, পথচলার মাইলফলক, জাতীয় জীবনের শিক্ষণীয় ইতিহাস। হায়দারাবাদের করুণ পরিণতি আমাদের অনেক কিছু বলতে চায়, অনেক কিছুর ইঙ্গিত করে। তাইতো আজ এতদিন পর হায়দারাবাদের ইতিহাস আমাদের সামনে ফিরে ফিরে আসছে। সেজন্যই বারবার বলা হয়, ইতিহাস কেবল অতীত নয়, এককথায় একটি জাতির ভবিষ্যৎও। খননকাজ চালিয়ে বিলুপ্ত ইতিহাসকে উদ্ধার করে যতই স্বস্থানে স্থাপন করা যাবে, জাতির আত্মার রূপরেখা নির্মাণের কাজটি ততই সহজতর হবে। ১৯৯৫ সালে ফিরে এসে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। কথা বলেছি। তাদের বেশির ভাগই বলেছেন, হায়দারাবাদের ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে আমাদের কী লাভ? তা ছাড়া দুদিন আগে হোক পরে হোক, ভারত হায়দারাবাদ গ্রাস করতই।

আমার কথা ছিল, পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান ভালোভাবে জানা থাকলে কেউ একজন কম ভুল করে। হায়দারাবাদ নিয়ে কথা বলার অর্থ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নয়। কী কী ভুলে কোন কোন পথ দিয়ে বিপদ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, সে সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাই এখানে লক্ষ্য। জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি প্রয়োজনে সতর্ক করা হতে পারে। এটাই হায়দারাবাদ পর্যালোচনার অর্থ। আর দুদিন আগে-পরে ভারত হায়দারাবাদ গ্রাস করতই বলে যদি নির্লিপ্ত থাকেন, তাহলে তো বলতেই হয়—বাংলাদেশের সামনে ঘোর বিপদ। এখানেও তো কেউ বলতেই পারে, দুদিন আগে আর পরে ভারত বাংলাদেশকে গ্রাস করতই। এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন উদাসীন উক্তি প্রমাণ করে, আমাদের সাবধান হতেই হবে।

আজকের মতো ১৯৯৮ সালেও শেখ হাসিনার সরকার ভারতকে ট্রানজিট-করিডোর দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। সে সময় আমার মনে হয়েছিল, এর বিপজ্জনক দিক সম্পর্কে জনগণকে জানাতে হবে। আমি হায়দারাবাদ পতনের কারণ ও আজকের বাংলাদেশ রক্ষার জন্য করণীয় সম্পর্কে এক সেমিনারের আয়োজন করি জাতীয় প্রেস ক্লাবে। তারিখটা ছিল ১৩ সেপ্টেম্বর। সে সময় হায়দারাবাদের ওপর একটি প্রবন্ধ লেখানোর জন্য যোগাযোগ করি

https://nagorikpathagar.org

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন ইতিহাসের অধ্যাপকের সঙ্গে। তাঁরা প্রত্যেকেই আমাকে নিরাশ করেন। কেউ বলেছেন, প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত হাতে নেই। কেউবা বলেছেন, দেশের যে সঙ্গিন অবস্থা, এই সময়ে ভারতবিরোধী লেখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কেউবা হাত-পা ঝেড়ে বলেছেন, এসব লিখে কী হবে? শেষ পর্যন্ত এগিয়ে আসেন আমাদের সবারই প্রিয় মানুষ আরিফুল হক। অভিনেতা, নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক আরিফুল হক। যদিও তিনি প্রচলিত অর্থে গবেষক বা ইতিহাস গবেষক ছিলেন না, তবুও সংকটকালের আহ্বান তিনি উপেক্ষা করেননি। আরিফুল হক ভাই এক সপ্তাহ খাটাখাটনি করে তৈরি করলেন একটা প্রবন্ধ। সেটা পাঠ করলেন সেমিনারে।

আরিফুল হক ভাই বললেন, ভারত পরিচালিত হয় তাদের রাষ্ট্রগুরু কৌটিল্যের বিধান ও উপদেশকে শিরোধার্য করে। সেই কৌটিল্য, যিনি চাণক্য নামেও পরিচিত, ভারতের রাজা ও শাসকদের বলে গেছেন, ক্ষমতা অর্জনের লোভ এবং অন্য দেশ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষাকে কখনো মন থেকে মুছে যেতে দেবে না। সব সীমান্তবর্তী রাজাকে শত্রু মনে করতে হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে বাদ দিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে। সারা পৃথিবী চাইলেও তুমি নিজে শান্তির কথা চিন্তা করতে পারবে না। তবে বাহ্যিকভাবে শান্তি এবং সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের ভান করে নিজের আসল উদ্দেশ্য আড়াল করার অভিপ্রায়ে একে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করা যাবে।

এই দর্শনের বিষময় ফল ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলো আজও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ভারত আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে একে একে গ্রাস করে ফেলে জুনাগড়, মানভাদ ও হায়দারাবাদকে। পরে সিকিমকে। আর আজ ভারতের প্রতিবেশী প্রতিটি দেশ নানাভাবে ভারতীয় আগ্রাসনের শিকার, অথবা ভারত কর্তৃক নানাভাবে নির্যাতিত। এই অশুভ আগ্রাসনের বিপদ সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে জানাতেই আমি লিখব।

আরিফুল হকের তখন ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় আগ্রাসনের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাওয়া। তার কথা ঠিকই। রবীন্দ্রনাথ এই উপমহাদেশের শক, হুন, মুঘল, পাঠানকে এক দেহে লীন করতে চেয়েছিলেন। পণ্ডিত নেহরু স্বপ্ন দেখতেন, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত সব এলাকা একদিন ভারতের একচ্ছত্র দখলে চলে আসবে। তখন স্বাধীন সত্তা নিয়ে ছোটো ছোটো দেশগুলো টিকে থাকতে পারবে না। গান্ধী উপমহাদেশের সংস্কৃতিকে অভিন্ন বলে জানতেন। রবার্ট বায়রন তার *দ্যা স্টেটসম্যান অব ইন্ডিয়া*

https://nagorikpathagar.org

গ্রন্থে লিখেছেন—'বাল গঙ্গাধর তিলক বলেছেন, এই উপমহাদেশের মুসলমান অধিবাসীরা হলো বিদেশি দখলদার, কাজেই তাদের শারীরিকভাবে নির্মূল করতে হবে।' কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী বলেছিলেন, 'কংগ্রেস বা ভারতীয় জাতি কখনোই অখণ্ড ভারতের দাবি পরিত্যাগ করবে না।' ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলতেন—'আজ হোক কাল হোক আমরা আবার এক হব এবং বৃহৎ ভারতের প্রতি আনুগত্য দেখাব।'

মোটকথা, চরিত্রগতভাবেই ভারত তার আশপাশের কোনো জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ১৯৪৭ সালের ৫ এপ্রিল হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে সর্বভারতীয় হিন্দু নেতা সাভারকার এক বাণীতে বলেছিলেন—'প্রথমত পশ্চিমবঙ্গে একটা হিন্দু প্রদেশ গঠন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যেকোনো মূল্যে আসাম থেকে মুসলিমদের বিতাড়ন করে এই দুটি হিন্দু প্রদেশের মাঝে ফেলে পূর্ব পাকিস্তানকে পিষে মারতে হবে।'

এই সাম্প্রদায়িক দর্শন থেকেই ১৯৪৭ সালে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে গঠন করা হয় হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৪৭ থেকে ৮৫ সালের মধ্যে আসাম থেকে মুসলিম বিতাড়ন প্রক্রিয়াও শেষ করা হয়েছে। এখন পিষে ফেলতে বাকি আছে বাংলাদেশ। তারই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। এই সময় হায়দারাবাদের দৃষ্টান্ত আমাদের সতর্ক হওয়ার সুযোগ করে দেবে বলে বিশ্বাস করি।

সে সময় আরিফুল হকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে আমরা বেশ কটি বড়ো বড়ো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যালির আয়োজন করি, যা ছিল বাংলাদেশের সমকালীন ইতিহাসে অভূতপূর্ব। পরে ষড়যন্ত্রের জালে আটকে যায় সব আয়োজন। হতাশা ঘিরে ধরে আমাদের।

আরিফুল হক তখন থাকতেন তার শাহীনবাগের বাসায়। এখান থেকেই হঠাৎ একদিন তিনি দেশের রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক যোদ্ধাদের অজ্ঞতা, মূর্খতা, স্বার্থপরতা ও হানাহানি দেখে অতিষ্ঠ হয়ে অনেকটা অভিমান করে চলে যান কানাডায়। তারপর বহুবার তাকে ফিরে আসার অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি ফিরে আসেননি। ২০০১ সালে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় এলে তাকে ফিরিয়ে আনার এক জোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। সে সময় তাকে গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবি দিয়েও সম্মানিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু তার এককথা—আমি ফিরছি না। একটি পরাজিত যুদ্ধের দর্শক হওয়ার কোনো রকম ইচ্ছে আমার নেই।

আমাদের অনুরোধ এবং পীড়াপীড়ির জবাবে তিনি বলতেন—'ভাইরে, একদিন সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে

https://nagorikpathagar.org

হিজরত করে বাংলাদেশে এসেছিলাম। সেই বাংলাদেশ আজ নিজের লোকদের কারণেই ভেতর থেকে ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, প্রশাসন—সর্বত্র এখন চলছে নৈরাজ্য। এই নৈরাজ্য ভারতের ইঙ্গিতে, ভারতের অর্থে বাংলাদেশের একশ্রেণির অবিমৃশ্যকারী রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, আমলা ও লেখক-শিল্পীর দ্বারা সূচিত হয়েছে। জাতি হিসেবে বাংলাদেশিদের বিপন্ন করার জন্য পুরো দেশের সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বিভেদ, হানাহানি ও ঘৃণা। পরিষ্কারভাবে বাংলাদেশ আজ দু-ভাগে বিভক্ত। জাতীয় ঐক্য ও সংস্কৃতির প্রদীপ নিভুনিভু করে জ্বলছে। যারা দেশপ্রেমিক তারা আজ উপেক্ষিত। যারা ভারতীয় আগ্রাসনকে ত্বরান্বিত করার জন্য কাজ করছে, তাদের 'হিরো' হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের বিরাট অংশ ভারতের দালালিতে লিপ্ত। গণমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে এমনভাবে সিন্ডিকেটেড প্রচার-প্রচারণা চলছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বিভ্রান্তি। তারা আজ অনুধাবন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে—কোনটি সঠিক, কোনটি বেঠিক। আমাদের রাজনীতিবিদদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভারতের পায়ের ওপর সিজদায় পড়ে আছে।

এ রকম অবস্থায় আমার মতো একজন সাধারণ সংস্কৃতিকর্মী আর কী করতে পারে? আমি তো সব খ্যাতি-প্রতিপত্তি পাশ কাটিয়ে, মঞ্চের হাতছানিকে ভ্রুক্ষেপ না করে মাঠে নেমে এসেছিলাম। জনগণের মধ্যে কাজ করতে চেয়েছিলাম। লাভ কী হলো? যাদের নিয়ে কাজ করার জন্য সব ত্যাগ করে এসেছিলাম, তারা আমাকে ন্যূনতম সম্মানটুকুও দেয়নি। কদর করেনি। উলটো বোঝাতে চেয়েছে, আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে এখানে এসেছি। সত্যি বলছি, শেষের দিকে নিজেকে বড়ো বেশি অবাঞ্ছিত মনে হতো। আমি চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়ি। অথচ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের টিকে থাকার পাটাতনগুলো এক এক করে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে ধ্বংস করা হচ্ছে। আর প্রতিদিন বাংলাদেশ ঢুকে পড়ছে ভারতীয় আগ্রাসনের আরও গভীরে, আরও গভীরে!

অসহায়ভাবে এই দৃশ্য দেখার জন্য আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, নিজেকে দর্শকের ভূমিকায় দেখতে হবে—এটা আমার সহ্য হয়নি। যে আবেগ ও আশা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলাম, তা-ই যখন থাকল না, তখন আর বাংলাদেশে থেকে কী হবে? তাইতো আমি আবার যাযাবর হলাম। চলে এসেছি কানাডায়।

এখানে আমার কোনো কাজ নেই। আমি এদের কেউ নই। সেও ভালো। সে আমার সয়ে যাচ্ছে। এখানে কেউ নিজেদের কবর নিজেরা খোঁড়ে না। এখানে ভাড়াখাটা রাজনীতিবিদ নেই। ভাড়াখাটা বুদ্ধিজীবী নেই, কবি-লেখকও নেই।

https://nagorikpathagar.org

এখানে চারপাশে কোনো ভারত নেই বলে কোথাও কোনো অশান্তি নেই। বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আছি বলে দেশের দুর্ভাগ্য আমাকে তাড়িত করে না। দৈনন্দিন দাহগুলো আমাকে পোড়াতে পারে না। বাংলাদেশ যদি কোনো নাটকের নাম হয়, তাহলে তার শেষ অঙ্ক দেখার জন্য আমাকে আর কষ্টে কঁকিয়ে উঠতে হবে না। বিশ্বাস করুন, যে নিদারুণ দুঃখ, কষ্ট ও যাতনা ভোগ করেছেন সৈয়দ কুতুবউদ্দিন, সেই কষ্ট আমার এই বয়সে আমি আর সহ্য করতে পারব না। আমাকে দূরেই থাকতে দিন।'

আরিফুল হকের মতো মহাপ্রাণ মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছেন। তার একটা যাওয়ার জায়গা ছিল কানাডাতে। তিনি সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পেরেছেন। কিন্তু আমার-আপনার মতো আমজনতা কোথায় যাবে? আমাদের তো পালিয়ে বাঁচারও জায়গা নেই। যেহেতু আমাদের পালিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই। অতএব, আমাদের কাজ হবে মাতৃভূমির রাষ্ট্রিক ভিত্তি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাওয়া। সে কাজের কে মূল্য দিলো, কে দিলো না, সে হিসাব-নিকাশ করে লাভ নেই। তাহলে হতাশা আসবে এবং আরও অরক্ষিত হয়ে যাবে দেশ। তা আমরা হতে দিতে পারি না। তাই যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে বাংলাদেশের সরাব জঞ্জাল। তারপর ইতিহাসের হাতে সমর্পণ করব নিজেদের।

https://nagorikpathagar.org

হায়দারাবাদ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আবারও মনে পড়ল গালিবের কবিতা—

নাহ্ গুলে নগমহ্ হু, না পরদহ সাজ,
মৈ, হু আপনি শিকস্ত-কী আওয়াজ।

[কবিতার ফুল নই, সেতারের পরদা নই। আমি কেবল একটি আওয়াজ, পরাজয়ে ভেঙে পড়ার আওয়াজ।]

শুধু যে পরাজয়ে ভেঙে পড়ার আওয়াজ তা-ই নয়। মৌনতার আবরণে ঢাকা একটি গোরস্থানের নিভে যাওয়া প্রদীপ হলো হায়দারাবাদ।

যে 'কোহিনূর' হীরক খণ্ড নিয়ে পৃথিবীজুড়ে তুলকালাম, ১৮৫৭ সালে দিল্লি লুণ্ঠনের সময় যে পৃথিবীর জ্যোতিকে লুট করে নিয়ে গেছে সাদা চামড়ার ঔপনিবেশিক ব্রিটিশরা, সেই কোহিনূরের জন্মভূমি হায়দারাবাদ। গোদাবরী, কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা, পূর্ণা, ভীমা, পেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা, মুসী, প্রাণহিতার মতো নদী যে হায়দারাবাদকে করেছে সুজলা-সুফলা—সেই হায়দারাবাদেই আছে ইতিহাসখ্যাত অজন্তা ইলোরা গুহা। আওরঙ্গাবাদ, ওসমানাবাদ, গোলকুণ্ডা, গুলবার্গা, রাইচুর, পারেন্দা, সুদগল প্রভৃতি দুর্গ হায়দারাবাদকে দিয়েছিল ঐশ্বর্য। আবার হীরক, স্বর্ণ, লৌহ, কয়লা ও অভ্রের খনি হায়দারাবাদকে করেছিল সমৃদ্ধ। পাশাপাশি মক্কা মসজিদ, চার মিনার যে রাষ্ট্রকে দিয়েছিল আভিজাত্য; সেই হায়দারাবাদ এখন এক নিঝুম গোরস্থান, এক নিভে যাওয়া প্রদীপ। আজকের নব্য ভারতীয়দের প্রচণ্ড কোলাহলের নিচে চাপা পড়ে গেছে হায়দারাবাদের প্রাণ। সবকিছুই এখন স্মৃতি, ধূসর স্মৃতি।

হায়দারাবাদের আয়তন ছিল ৮২ হাজার ৬৯৮ বর্গমাইল। হায়দারাবাদের উত্তরে ছিল ভারতের মধ্য প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিমে মহারাষ্ট্র। দক্ষিণে কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা নদী, পশ্চিমে আহমদনগর, বিজাপুর। পূর্বে ছিল তামিলনাড়ু। এই সীমানা ও আয়তন ১৯৪৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর হায়দারাবাদের পতনের সময়কার। অতীতের হায়দারাবাদ ছিল আরও বড়ো একটি দেশ। দাক্ষিণাত্যের এই দেশটির ইতিহাসও

https://nagorikpathagar.org

অনেক প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দ্রাবিড় সভ্যতা এই রাষ্ট্রেরই পূর্বাঞ্চলসহ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ব্যাপ্ত ছিল। আজকের তেলেগুভাষীরা সেই দ্রাবিড়দেরই উত্তর-পুরুষ।

রোমে যেমন শাসককে বলা হতো সিজার, রাশিয়ায় যেমন জার, সেই রকম হায়দারাবাদের শাসকদের উপাধি ছিল 'নিজাম'। হায়দারাবাদ এবং নিজামশাহী আমল একই ইতিহাসের এপিঠ-ওপিঠ। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কৃতী সেনাপতি ছিলেন মীর কমরউদ্দিন খান আসফজাহ। ১৭১৩ সালে আওরঙ্গজেব তাকে নিজাম-উল-মুলক উপাধি দিয়ে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিযুক্ত করে পাঠান। তারপর আওরঙ্গজেবের পর নানা উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে ১৭২৪ সালে এই দাক্ষিণাত্যেই স্বাধীন-সার্বভৌম হায়দারাবাদ রাষ্ট্রের পত্তন করেন আসফজাহ। শুরু হয় আসফজাহ বংশের নিজামদের শাসন।

প্রথম নিজাম মীর কমরউদ্দিন খান আসফজাহের মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় ছেলে মীর আহমদ খান নাসির জং এবং কন্যা খায়রুন্নিসার ছেলে মুজফফর জঙ্গের মধ্যে শুরু হয় উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব। হায়দারাবাদের সিংহাসন নিয়ে এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে বহিরাগত ইউরোপীয় বণিকরা। ইংরেজ বণিকরা নাসির জঙ্গের পক্ষে এবং ফরাসিরা মুজফফর জঙ্গের পক্ষ নেয়। শেষ পর্যন্ত মুজফফর জং পরাজিত ও বন্দি হন। দু-বছর পর নাসির জং আততায়ীর হাতে নিহত হলে মুজাফফর জং নিজেকে হায়দারাবাদের নিজাম হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবেই স্বাধীন হায়দারাবাদের ওপর বিদেশি হস্তক্ষেপের পথ সুগম হয়।

সেই সময়কার উপমহাদেশের দিকে তাকানো যেতে পারে। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য অস্তাচলগামী। দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছে। সেই সুযোগে সমগ্র উপমহাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শুরু হয়েছে ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি। মন্ত্রী, সমরনায়কদের বিশ্বাসঘাতকতা। অন্যদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে হিন্দু মারাঠা শক্তি। বাংলায় ততদিনে ঘটে গেছে ভয়ংকর পালাবদল। ১৭৫৭ সালে পলাশির প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মীরজাফরের ঘাড়ে চেপে বাংলা বিহার উড়িষ্যার ক্ষমতা দখল করে বসেছে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তারা উপমহাদেশের মূল কেন্দ্রবিন্দুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। দেশীয় রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের ভেতরকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং এক দেশের বিরুদ্ধে অপরের বিদ্বেষ ও ঘৃণা পুঁজি করে সে সময় ইংরেজ ও ফরাসি বণিকরা বাড়িয়ে নিচ্ছিল নিজেদের প্রভাব। নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োগ করছিল নানামাত্রিক কূটকৌশল, বিস্তার করছিল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল। এই জালে একে একে জড়িয়ে পড়তে থাকে দেশীয় স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো।

https://nagorikpathagar.org

এভাবেই হায়দারাবাদের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে আবির্ভূত হয় ঔপনিবেশিক ইংরেজ বণিকরা। কর্ণাটকের যুদ্ধে ক্লাইভের সাফল্যের পর ইংরেজরা হায়দারাবাদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করার জন্য আসফ জাহের তৃতীয় ছেলে সালাবত জংকে (১৭৫১-১৭৬২) ক্ষমতায় বসায়। কিছুদিন পর তাকে সিংহাসনচ্যুত করে চতুর্থ ছেলে নিজাম আলি খানকে হায়দারাবাদের 'নিজাম' করে (১৭৬২-১৮০৩)।

ইংরেজ বণিকদের এই বশংবদই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষাবলম্বন করে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। তাকে পরাজিত ও নিহত করার পেছনে হায়দারাবাদের নিজাম আলি খানের যে ঘৃণ্য ভূমিকা, তা ভারতের জাতীয় ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়।

এর পেছনে আরও কারণ বিদ্যমান। ইংরেজরা তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ছাড়িয়ে একে একে কবজা করে নিচ্ছিল ছোটো ছোটো স্বাধীন রাজ্যগুলো। দাক্ষিণাত্য চলে যায় ইংরেজদের দখলে। হিন্দু মারাঠা শক্তি ইংরেজদের সাহায্যে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসে। এ রকম পরিস্থিতিতে ১৭৬৮ সালে ইংরেজদের সঙ্গে এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে নিজাম আলি খান। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হায়দারাবাদের চারটি অঞ্চল চলে যায় ইংরেজদের দখলে। ইংরেজরা নিজস্ব সৈন্যবাহিনী রাখার অধিকার পায়। আর উভয়পক্ষের কোনো এক পক্ষ অন্য কারও সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে একপক্ষ অন্য পক্ষকে সর্বাত্মক সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে মর্মে একটা চুক্তি হয়। এ রকম চুক্তির কারণেই ৪র্থ মহীশূর যুদ্ধে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল নিজাম।

সে সময় হায়দারাবাদের আয়তন ছিল আজকের ফ্রান্সের সমান। কিন্তু ইংরেজরা নানা ছলচাতুরী করে প্রতি বছরই একটু একটু করে গ্রাস করতে থাকে দেশটি। এভাবে হায়দারাবাদের হাতছাড়া হয়ে যায় বেরার প্রদেশ, কুড্ডাপপা, কুর্নুল, বেলারি, অনন্তপুর জেলা। বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলো, যার মাধ্যমে হায়দারাবাদ সংযুক্ত ছিল সমুদ্রের সঙ্গে, সেগুলো একে একে হাতছাড়া হয়ে যায়। সমুদ্রপথ বন্ধ হয়ে হায়দারাবাদ চারদিক থেকেই স্থলবন্দি হয়ে পড়ে, যা পরবর্তী সময়ে তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গবেষক আরিফুল হক বলেছেন, সেদিন হায়দারাবাদের নিজামরা যেমন ভুল করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের সমুদ্রবন্দর বিদেশিদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা গৃহবন্দি হয়ে পড়েছিলেন, তেমনি আজকের বাংলাদেশও পার্বত্য শান্তিচুক্তির নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরসহ সম্পূর্ণ কক্সবাজার

https://nagorikpathagar.org

উপকূল ভারতের প্রভাববলয়ে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা গৃহবন্দি হতে চলেছে। এ যেন একই নীলনকশার পুনরাবৃত্তি। অথচ আমরা এই নীলনকশা পড়তে বা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। প্রত্যেক জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কোনো জাতির জীবনে যখন অধোগতির চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণ এগিয়ে আসে, তখন সে এভাবেই অসচেতন হয়ে আপন ভুলের আবর্তে আপনিই তলিয়ে যায়, যেমন হায়দারাবাদ গিয়েছিল।

এ রকম টানাপোড়েনের ভেতর দিয়েই এগিয়ে এলো ১৯৪৭ সাল। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, ভারতকে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান দুটি এলাকায় ভাগ করে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। তারপর তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ভারত ছেড়ে যাবে ব্রিটিশরা।

গবেষকরা বলছেন, এ সময় আর একটি সমস্যা সামনে চলে আসে। তা হলো দেশীয় রাজ্য সমস্যা। সে সময় ভারতে কয়েক শ দেশীয় রাজ্য ছিল। যেগুলো ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বিশেষ চুক্তির আওতায় পরিচালিত হতো। ভারত দু-ভাগে বিভক্ত হলে এই স্বাধীন করদরাজ্যগুলোর ভবিষ্যৎ কী হবে? সে সময় ব্রিটিশ সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ভারতে নিযুক্ত শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে বাকিংহাম প্যালেসে ডেকে নিয়ে তার উৎকণ্ঠার কথা জানিয়ে বলেন—'দেশীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে ব্রিটেনের সরাসরি সন্ধি রয়েছে। ভারত স্বাধীন হয়ে গেলে এই সন্ধির ইতি ঘটবে। সেক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যগুলোর বেলায় বিরাট শূন্যতা দেখা দেবে। তখন ওই রাজ্যের রাজারা গভীর সংকটে পতিত হবে। সুতরাং ওরা যাতে স্বাধীন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, সে বিষয়টি যেন বিশেষভাবে দেখা হয়।'

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে ভারতীয় প্রদেশগুলো ও দেশীয় মিত্র করদরাজ্যগুলোকে নিয়ে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেছিল ব্রিটিশরা। সে প্রস্তাবে গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্টে হায়দারাবাদকে স্বাধীন মর্যাদা দান করে বলা হয়েছিল, দেশীয় রাজ্যগুলোর পদমর্যাদা এবং স্বাভাবিক কার্যাবলি স্বাধীন ভারতের কাছে, রাজ্যগুলোর অনুমতি ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা যাবে না।

১৯৪৭ সালে প্রণীত ভারত স্বাধীনতা আইনে বলা হলো, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর দেশীয় রাজ্যগুলোর ওপর থেকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ অবসানের পর রাজ্যগুলো ইচ্ছামতো ভারত অথবা পাকিস্তান ডোমিনিয়নে যোগ দিতে পারবে অথবা স্বাধীন থাকতে পারবে।

https://nagorikpathagar.org

১৯৪৭ সালের ১৬ জুলাই লন্ডনে ভারতবিষয়ক সচিব লর্ড লিস্টোয়েল লর্ড সভায় বলেছিলেন—'এখন থেকে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলো থেকে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি প্রত্যাহার এবং তাদের দাফতরিক কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। দেশীয় রাজ্যগুলো ভারত, পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোনটিতে যোগ দেবে অথবা একক স্বাধীনসত্তা বজায় রাখবে, তা সম্পূর্ণ তাদের স্বাধীন ইচ্ছাধীন। ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে কোনো রকম প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে না।' ১৯৪৭ সালের ৯ জুলাই অর্থাৎ ভারত সচিবের বক্তব্য দেওয়ার আগেই নিজাম অবশ্য শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যানেলেকে জানিয়ে দেন—ব্রিটিশরাজ ও হায়দারাবাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক হায়দারাবাদ তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়। এভাবেই ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাসের সঙ্গে সঙ্গে হায়দারাবাদের ওপর ব্রিটিশ খবরদারির অবসান ঘটে। যেহেতু হায়দারাবাদ ও ব্রিটিশদের মধ্যে পূর্বের চুক্তিগুলো ব্রিটিশরাই বাতিল ঘোষণা করেছিল, সেহেতু কোনো ধরনের চুক্তি দ্বারাই হায়দারাবাদ আর আবদ্ধ থাকল না।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়া হলো। ১৫ আগস্ট গোলামির চিহ্ন মাথায় নিয়ে, অর্থাৎ লর্ড মাউন্টেন ব্যাটেনকেই ভারতের গভর্নর জেনারেল করে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠিত হলো। ওই দিন হায়দারাবাদও তার স্বাধীনতা ঘোষণা করল। অর্থাৎ, ওইদিন থেকেই হায়দারাবাদ ভারত ও প্যাকিস্তানে মতোই একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদা লাভ করল।

https://nagorikpathagar.org

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ২৪ বছর আগে, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট হায়দারাবাদ যখন স্বাধীন হয়, তারও বহু আগে থেকে শুরু হয় নেহেরু-প্যাটেল-মাউন্ট ব্যাটেনের ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মাউন্ট ব্যাটেনের প্রভাব কাজে লাগানোর জন্য ভারতীয় কংগ্রেস নেতারা স্বাধীনতার পরও ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হওয়া সত্ত্বেও তাকেই ভাইসরয় হিসেবে চাকরিতে রেখে দেয়।

মাউন্ট ব্যাটেন তার নিমকহালালি প্রত্যাশার চেয়েও বেশি পালন করে র‍্যাডক্লিফকে দিয়ে অদ্ভুত এবং কিম্ভূতকিমাকারভাবে সীমানা চিহ্নিত করলেন। তার সব কর্মকাণ্ডও পরিচালিত হয় কংগ্রেসের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর মতো। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইনে বলা হয়েছিল—দেশীয় তথা করদমিত্র রাজ্যগুলো ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর নিজ নিজ ইচ্ছেমতো ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে। অথবা স্বাধীন থাকতে পারবে। কিন্তু কংগ্রেস ও মাউন্ট ব্যাটেনের চক্রান্তের ফলে এই আইন কার্যকর হতে পারেনি। কংগ্রেস নেতারা দেশীয় রাজ্যগুলোকে ভারতের মধ্যে ঢোকানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। তারা দেশীয় রাজ্য আত্তীকরণের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ চালু করেন, যার প্রধান হন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের মতো সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি আর সেক্রেটারি করা হয় ভিপি মেননের মতো ধুরন্ধর কূটনীতিককে।

প্যাটেল বুঝে গিয়েছিলেন, ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়ার পর দেশীয় রাজ্যগুলো আপনা-আপনি স্বাধীন হয়ে যাবে। তখন তাদের ভারতভুক্তি যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। সেজন্য ব্রিটিশ শাসনের অবসানের আগেই এই রাজ্যগুলোর গলা টিপে ধরতে হবে। বাধ্য করতে হবে ভারতভুক্তির। এই কাজে মাউন্ট ব্যাটেন হয়ে ওঠেন কংগ্রেসের তুরুপের তাস।

নেহেরু-প্যাটেলের পরামর্শ অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ২৫ জুলাই মাউন্ট ব্যাটেন ব্রিটিশ ভাইসরয় হিসেবে দিল্লিতে দেশীয় রাজাদের এক বৈঠক ডাকলেন। সেখানে ব্রিটেনের ঘোষিত ভারত স্বাধীন আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে, মাউন্ট

https://nagorikpathagar.org

ব্যাটেন কংগ্রেসের নির্লজ্জ দালালের মতো দেশীয় রাজাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেন ভারতে বিলীন হওয়ার জন্য। এ ব্যাপারে মীর লায়েক আলিকে উদ্ধৃত করে আরিফুল হক লেখেন—মাউন্ট ব্যাটেন দেশীয় রাজাদের বলেন, ভারতে যোগ দিলে কংগ্রেসের পরিকল্পনায় ভারতভুক্তির দলিলে তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা আছে। কী সেই সুবিধা, সে কথা উহ্য রেখেই তিনি তাদের পরোক্ষভাবে হুমকি দিয়ে বললে—'১৫ আগস্টের পর তাদের হয়ে তার কোনো কিছু করার ক্ষমতা আর থাকবে না এবং যেসব দেশীয় রাজ্য স্বাধীন থাকার জন্য অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার চিন্তা করছে, তাদের চিন্তা কোনো কাজে লাগবে না।' তিনি আরও বললেন—'দেশীয় রাজারা যদি ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন; তবে ভবিষ্যতে তাদের পদবি, সম্মান যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, সেজন্য তিনি কংগ্রেসকে রাজি করাবেন। ভাইসরয়ের সেদিনের আশ্বাস যে কত বড়ো মিথ্যা ছিল, পরবর্তী সময়ে ভারতের পেটে দেশীয় রাজ্যগুলোর অবলুপ্তিই তার সাক্ষ্য বহন করে।

কংগ্রেস ও মাউন্ট ব্যাটেনের এই কূটকৌশল 'ভয়ংকর অনুরোধ এবং ভয়াবহতম চাপ' সেদিন অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিয়েছিল। দেশীয় রাজ্যগুলোর অধিকাংশই ১৫ আগস্টের আগে ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হয়েছিল। যারা ভারতের দাসত্বের খোঁয়াড়ে ঢুকতে চাননি, তাদের জন্য এই চক্র গ্রহণ করল ভিন্ন পথ। তাদের রাজ্যে কংগ্রেসের নানা গোপন সংস্থাকে গোলযোগ সৃষ্টির কাজে লেলিয়ে দেওয়া হলো। যেমন, ত্রিবাংকুরের মহারাজা ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলেন। তিনি মাউন্ট ব্যাটেনকে জানালেন সে কথা। ব্যস, আর যায় কোথায়। মহারাজা দিল্লি থেকে কোচিনে পৌঁছার আগেই তার রাজ্যের কংগ্রেসের গোপন সন্ত্রাসী সংস্থাগুলো সদন্তে নেমে এলো রাস্তায়। তারা পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড, গুলি-বোমা ইত্যাদির মাধ্যমে কোচিনে সৃষ্টি করা হলো এক শ্বাসরুদ্ধকর নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ত্রিবাংকুরের মহারাজা মাউন্ট ব্যাটেনের সাহায্য চাইলেন। কংগ্রেসের বশংবদ ব্যাটেন তাকে ভারতের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য চাপ দিলে অনেকটা অসহায় হয়েই মহারাজা ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করে স্বাধীনতা হারালেন।

কংগ্রেসের পরবর্তী শিকার হয় যোধপুর। যোধপুর ছিল ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী রাজ্য। এর মহারাজা ছিলেন কংগ্রেসের প্রতি ভয়ানক বীতশ্রদ্ধ। তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তানে যোগদান করতে। তার ইচ্ছা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিপি মেনন তাকে প্রতারণার মাধ্যমে মিথ্যা কথা বলে নিয়ে যান

https://nagorikpathagar.org

মাউন্ট ব্যাটেনের সামনে। মাউন্ট ব্যাটেন তাকে এমনভাবে ভীতি প্রদর্শন করেন যে, ভীত-সন্ত্রস্ত হতবিহ্বল মহারাজা বাধ্য হয়ে ভারতের কাছে ধরা দেন।

দেশীয় রাজ্য ভূপালের ভারতভুক্তিও নেহরু-ব্যাটেনের ষড়যন্ত্রের ফল। এখানেও ত্রিবাংকুরের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কংগ্রেস। কংগ্রেসের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকরা রাজ্যজুড়ে সৃষ্টি করে নৈরাজ্য। লিপ্ত হয় ধ্বংসাত্মক কাজে। পাশাপাশি নেহরু, প্যাটেল ও মাউন্ট ব্যাটেন ভূপালের নবাবের ওপর সৃষ্টি করেন প্রচণ্ড চাপ। দেওয়া হতে থাকে হুমকি। ফলে ভূপালের নবাবও তার রাজ্যের স্বাধীনতা তুলে দেন ভারতের হাতে। এভাবে দেখা যায়, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যে হায়দারাবাদ, জুনাগড় ও কাশ্মীর ছাড়া সব রাজ্যই ভারতের পদতলে তাদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল। মাউন্ট ব্যাটেনের এই অপকর্ম ব্রিটিশ সরকার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। প্রতিকারের জন্য এগিয়ে আসেনি।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর হায়দারাবাদ, জুনাগড় ও কাশ্মীর—এই তিনটি বেয়াড়া রাজ্য কীভাবে উদরস্থ করা যায়, তার জন্য নতুনভাবে কোমর বেঁধে নামে ভারত। মাউন্ট ব্যাটেনের নেতৃত্বে আঁটতে থাকে নানা ফন্দিফিকির। বিছাতে থাকে চক্রান্তের জাল। এই জালে তারা প্রথম জড়িয়ে ফেলে জুনাগড়কে। জুনাগড়ের অবস্থান ছিল বাংলাদেশের মতো। তিন দিক ছিল ভারতবেষ্টিত। একদিকে ছিল আরব সাগর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানে যোগদানের কথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যজুড়ে কংগ্রেস শুরু করে ধুন্ধুমার কাণ্ড। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটানো হয়। নবাব ও সরকার যখন রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সামলাতে ব্যস্ত, সেই সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ভারতীয় সৈন্যরা ঘেরাও করে ফেলে জুনাগড়।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে নবাবের প্রতিরোধব্যবস্থাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে তারা প্রবেশ করে জুনাগড়ে। দখল করে নেয় দেশটি। জুনাগড় দখলের সময় নেহরু-প্যাটেল-ব্যাটেন চক্র অজুহাত দেখিয়েছিল—জুনাগড়ের বেশির ভাগ জনগণ হিন্দু; তারা পাকিস্তানে নয়, ভারতে যোগদানের পক্ষে। সেজন্যই সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে। কাশ্মীরের বেলায় ভারত প্রদর্শন করে উলটো যুক্তি। বলে কাশ্মীরের জনগণ মুসলমান হতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না। কাশ্মীরের মহারাজা হিন্দু। তিনি ভারতভুক্তি চান। সবশেষে ভারতীয় আগ্রাসনের শিকার হয় স্বাধীন সার্বভৌম হায়দারাবাদ।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ভারত ছোটোখাটো শয়তানির মাধ্যমে হায়দারাবাদকে অস্থিতিশীল করার জন্য হাজারো চেষ্টা করে। কিন্তু দক্ষ

https://nagorikpathagar.org

হাতে সেগুলো মোকাবিলা করে নিজাম সরকার। ফলে নানা টালবাহানার পর একই বছর নভেম্বর মাসে হায়দারাবাদের সঙ্গে একটা নিষ্ক্রিয়তামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয় ভারত। একটু যেন নিশ্বাস ছাড়ার সময় পায় হায়দারাবাদ। তবে সে ছিল খুবই ক্ষণিকের। কারণ, এই চুক্তি স্বাক্ষর করে ভারত যেমন নিজেকে অপমানিত মনে করে, তেমনই এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে। সব আন্তর্জাতিক নীতিরীতি, আইনকানুনকে পদদলিত করে হায়দারাবাদকে গায়ের জোরে দখল করে নেওয়ার জন্য নতুনভাবে শুরু করে ষড়যন্ত্র। এসব ষড়যন্ত্রের কোনোটা ছিল প্রকাশ্য, বেশির ভাগই ছিল অপ্রকাশ্য।

১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে নেহরু, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, চুক্তি ও যুক্তিকে থোরাই কেয়ার করে অত্যন্ত দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করেন—'যখন প্রয়োজন মনে করব, হায়দারাবাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান শুরু করব।' নেহরুর এই দাম্ভিক, আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী উক্তি সম্পর্কে ১৯৪৮ সালের ৩০ জুলাই ব্রিটিশ কনজারভেটিভ পার্টির নেতা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল হাউস অব কমন্সে বলেন—'নেহরুর ভীতি প্রদর্শনের ভাষা অনেকটা হিটলারের ভাষার অনুরূপ, যা তিনি অস্ট্রিয়া ধ্বংস করার সময় ব্যবহার করেছিলেন।' (V.K. Bawa, *The Last Nizam*). তিনি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অভিমত দেন, 'তাদের পবিত্র দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে, যেসব রাজ্যকে সার্বভৌম মর্যাদা দান করা হয়েছে; সেগুলোকে গ্রাস করা, শ্বাসরুদ্ধ করা বা অনাহারে রেখে শক্তিহীন করার অপচেষ্টাকে ব্রিটিশ সরকার যেন অনুমোদন না দেয়।'

চার্চিলের এই আহ্বানে সেদিন গা লাগায়নি ব্রিটিশ সরকার। কারণ, তাদের কাছে হায়দারাবাদের চাইতে বৃহৎ ভারতের গুরুত্ব ছিল বেশি। ব্রিটিশ সরকারের সে সময়কার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না দেখার ভান করে থাকা। ভারতকে যা খুশি তা করার জন্য মওকা দেওয়া। এই মওকা ভারত যথার্থ অর্থেই কাজে লাগায়। ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকার পাশাপাশি বাদবাকি বিশ্বও ছিল হায়দারাবাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। মুসলিম দেশগুলো তো বটেই, এমনকি পাকিস্তান পর্যন্ত ভারতের হায়দারাবাদ দখল চক্রান্ত দেখেও আশানুরূপ সাড়া দেয়নি। হায়দারাবাদের মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। এই নিষ্ক্রিয় ভূমিকাই ভারতের জন্য সোনায় সোহাগা হয়ে ওঠে আর হায়দারাবাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতবেষ্টিত হায়দারাবাদের অস্তিত্ব নেহরু, প্যাটেল ও ব্যাটেনের জন্য গাত্রদাহের কারণ ছিল আগে থেকেই। এবার সেই জ্বালা নির্বাপণের জন্য তারা সামগ্রিকভাবে সব দিক থেকে হায়দারাবাদের ওপর আগ্রাসন চালানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। প্রণয়ন করেন পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে

https://nagorikpathagar.org

হায়দারাবাদের রাজনীতিকে কলুষিত করার কাজ শুরু হয়। সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে দালাল তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয়। শিক্ষাঙ্গন, সাংস্কৃতিক জগৎ, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সৃষ্টি করা হতে থাকে অনুগত লোকজন। সক্রিয় করা হয় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের। বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠনকে উসকে দেওয়া হয় নৈরাজ্যকর ও ধ্বংসাত্মক কাজে।

https://nagorikpathagar.org

ত্রিবাঙ্কুর, যোধপুর, ভূপাল ও জুনাগড় দখলের পর থেকেই ভারতের প্রধান ও একমাত্র টার্গেট হয়ে পড়ে হায়দারাবাদ। এজন্য হায়দারাবাদে বন্ধু ও অনুগত সেবাদাস তৈরির কাজে মন দেয় ভারত। রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিবৃত্তিক মহল, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, ব্যবসায়ী, আমলা ও সেনাবাহিনীর মধ্যে অর্থ, বিত্ত, পদক, স্কলারশিপ, পুরস্কার বিতরণ, ভালো পোস্টিংয়ের ব্যবস্থা ও পদোন্নয়নের মাধ্যমে তারা তৈরি করতে থাকে নিজেদের লোক। এই লোকরাই দেশপ্রেমের ভান ধরে গণমাধ্যমের বদৌলতে রাতারাতি এক একজন 'স্টারে' পরিণত হয়। আর যারা সত্যিকার দেশপ্রেমিক ছিল, তাদের 'বাজে' লোক বানিয়ে, নানান কেচ্ছাকাহিনি ছড়িয়ে ঠেলে দেওয়া হয় পেছনের দিকে। তৈরি হতে থাকে ভারতীয় সামরিক আগ্রাসনের ক্ষেত্র। হায়দারাবাদের আত্মপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে ভেতর থেকে ভঙ্গুর করে দেওয়ার জন্য হাজার হাজার সাংস্কৃতিক সংগঠনেরও জন্ম দেয় ভারত। যেভাবে এখন বাংলাদেশের ভেতর গজিয়ে উঠছে নানা ধরনের বাহারি বর্ণাঢ্য সংগঠন, গণমাধ্যম, গ্যালারি, ফাউন্ডেশন।

হায়দারাবাদের দুর্ভাগ্য—তার জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগ ছিল হিন্দু। সাধারণ হিন্দু জনতা হয়তো হায়দারাবাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি মমত্বশীল ছিল। কিন্তু তাদের যেসব সংগঠন ছিল, তার প্রায় পুরো নেতৃত্বেই প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে ছিল ভারতের বিশুদ্ধ দালাল। এই দালালদের বিষয়ে হায়দারাবাদ সরকারের কাছে বিস্তর অভিযোগ ছিল। অভিযোগ ছিল দেশের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কাজ চালানোর। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব, গণমাধ্যমের ঢালাও আনুকূল্য লাভ এবং ভারতীয় চাপের কারণে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয় হায়দারাবাদ সরকার।

হায়দারাবাদের প্রতিটি হিন্দু সংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা সবাই ছিল আসলে ভারতের কোনো না কোনো সংগঠনের শাখা। তাদের কাজকর্মও ছিল না মাতৃভূমির কল্যাণ ও মঙ্গলের সঙ্গে সংযুক্ত। তারা ভারতে অবস্থিত মূল সংগঠনের আদেশ-নির্দেশ ও প্রণীত কর্মসূচি দ্বারা পরিচালিত হতো। তাদের জন্য সীমান্তের ওপার থেকে আসত বস্তা বস্তা টাকা।

https://nagorikpathagar.org

আগাগোড়াই স্বাধীন হায়দারাবাদ ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। হায়দারাবাদের হিন্দু-মুসলিম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সম্প্রীতির সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি ভাইয়ের মতো, বন্ধুর মতো বসবাস করে আসছিল। রাষ্ট্র কখনোই কারও ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি; বরং ঈদ, মহররম, রামলীলা, গণেশ উৎসব ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসবে দুই ধর্মের লোক সমান আগ্রহে অংশ নিয়ে আনন্দকে সর্বজনীনতা দান করেছে। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতাও দুই ধর্মের লোক সমানভাবে পেয়ে এসেছে। এবার সেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধ্বংসের দিকে হাত বাড়াল হায়দারাবাদের ভারতের অনুগত নেতারা।

হায়দারাবাদকে ঘিরে থাকা তিনটি রাজ্যেই ১৯৪৬-এর নির্বাচনে সরকার গঠন করে কংগ্রেস। ব্রিটিশরা তখনও মাথার ওপর। তারপরও এই তিনটি সরকার হায়দারাবাদের অভ্যন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করে সর্বশক্তি। প্রথমেই তারা প্রয়োগ করে 'সত্যাগ্রহ' নামক গান্ধীবাদী অস্ত্র। হায়দারাবাদের কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, আরএসএস ও আর্য সমাজীগণ 'সত্যাগ্রহ' সফল করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ে মাঠে। যেহেতু তাদের হাতে সত্যাগ্রহ সফল করার মতো পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক ছিল না; হয়তো হায়দারাবাদের সাধারণ হিন্দু জনগণও এইসব হঠকারী ও ধ্বংসাত্মক কাজে অংশ নিতে অনীহা প্রকাশ করে; সেই জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভারত। সরাসরি হস্তক্ষেপ করে ভারতীয় সংগঠনগুলো।

সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকরা দলে দলে হায়দারাবাদে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। এ ব্যাপারে প্রধান সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেন তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশের (বর্তমানের মহারাষ্ট্র) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কংগ্রেস নেতা কে এস মুন্সী। তিনি রীতিমতো প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালিয়ে, রাষ্ট্রের অর্থ ব্যয় করে বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেন। তাদের এবং তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে হায়দারাবাদে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব দেওয়া হয় আইন অমান্য করার। বলা হয়, এই স্বেচ্ছাসেবকরা গলায় ফুলের মালা পরে হায়দারাবাদের বিভিন্ন শহরে আইন অমান্য করে গ্রেফতার বরণ করবে। এই স্বেচ্ছাসেবকদের বোঝানো হয়, তারা গ্রেফতার হতে পারে। কিন্তু নিজাম সরকারের কারাগারে তাদের কোনো ভয় নেই। কারণ, সেখানে ভারতের অনুগত কারাকর্মকর্তারা আছে। তারা তাদের ভালোভাবেই রাখবে। আবার যতদিন তারা কারাগারে থাকবে, ততদিন তাদের পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে ভারত।

https://nagorikpathagar.org

সত্যাগ্রহ পরিচালনা করা হয় নিজাম সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু এদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল হায়দারাবাদের জনগণ, বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠী আর হায়দারাবাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। উগ্র হিন্দুত্ববাদী সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে যোগ দেয় তথাকথিত সেক্যুলার সুশীল সমাজ। এদের প্রচেষ্টায় বিনষ্ট হয়ে যায় হায়দারাবাদের ঐতিহ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। মুসলমান নেতাদের মধ্যে যারা এই চক্রান্তের মূল উদ্দেশ্য জানতেন, তারা সত্যাগ্রহীদের আসল মতলব সম্পর্কে জনসাধারণকে সাবধান করতে লাগলেন। তাদের পাতানো ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সবার কাছে আহ্বান জানালেন। তারা বললেন—যেকোনো মূল্যে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টের চক্রান্ত রুখতে হবে। বাঁচাও হায়দারাবাদ, রুখো ভারত।

এই আহ্বানের বিরুদ্ধে ভারত ও হায়দারাবাদ দু-দেশেই চক্রান্তকারীরা বিক্ষোভ দেখাতে লাগল। তারা মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের চৌদ্দগোষ্ঠী গালাগাল করে দেশজুড়ে হইচই বাঁধিয়ে ফেলল। বোম্বাইর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে এস মুন্সীর নেতৃত্বে একদল বুদ্ধিজীবী হায়দারাবাদের মুসলিম জনগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক, তারা ধর্মোন্মাদ, হিন্দুবিদ্বেষী, তারা হিন্দুদের ওপর চালাচ্ছে সীমাহীন অত্যাচার, নির্যাতন ইত্যাদি নানা কল্পকাহিনি রচনা করতে লাগল। বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের একশ্রেণির নেতা ও কিছু ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের জনগণের ওপর সাম্প্রদায়িক লেবেল সাঁটানোর জন্য গত কয়েক দশক ধরে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, অনেকটা সেভাবেই দেশে-বিদেশে প্রচারণার ঝড় বইয়ে দেওয়া হলো।

এমন কায়দা করে হিন্দু জনতার ওপর মুসলমানদের অত্যাচার-নির্যাতনের কল্পকাহিনি প্রণীত হতে থাকল যে, সত্য ঘটনা চাপা পড়ে গেল। হায়দারাবাদের মুসলিম জনগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক, সেটাই বড়ো হয়ে দেখা দিলো। এই সাম্প্রদায়িক বানানোর প্রক্রিয়াকে আরও তীব্র ও বেগবান করার জন্য এগিয়ে এলেন হায়দারাবাদের কংগ্রেস নেতা স্বামী রামানন্দ তীর্থ। তিনি প্রচার শুরু করলেন, হায়দারাবাদের সরকার ও মুসলিম জনগোষ্ঠী পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক হয়ে গেছে। এই অবস্থায় হায়দারাবাদের হিন্দু জনগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। মুসলমানরা হিন্দুদের বাড়িঘর, জমিজমা, সহায়সম্পত্তি কেড়ে নিচ্ছে। তাদের মা-বোনের ইজ্জত কেড়ে নিচ্ছে। প্রতিনিয়ত দাঙ্গার শিকার হয়ে নিঃস্ব থেকে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে হিন্দুরা। অথচ তারাই হায়দারাবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। এই জুলুম-নির্যাতন মেনে নেওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে হিন্দুদের রুখে দাঁড়াতে হবে। স্বাধীন হায়দারাবাদ হিন্দুদের জন্য নরকে পরিণত হয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

এই জুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য হায়দারাবাদের স্বাধীন অস্তিত্বের বিলোপ জরুরি। হায়দারাবাদকে ভারতভুক্ত করতে হবে। শুধু ভারতভুক্তির মাধ্যমেই হায়দারাবাদের হিন্দু জনগণ বাঁচতে পারে। হায়দারাবাদে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে শান্তি। হিন্দুত্ববাদকে সামনে নিয়ে সেজন্য স্বামী রামানন্দ হায়দারাবাদের ভারতভুক্তির দাবিতে শুরু করলেন আইন অমান্য আন্দোলন।

দেশজুড়ে সৃষ্টি হলো ভয়ানক অরাজক পরিস্থিতি। অনেকে হায়দারাবাদ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়ে গঠন করলেন অ্যাকশন কমিটি। এই অ্যাকশন কমিটির ভারতের হাজার হাজার উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সীমান্ত অতিক্রম করে ঢুকতে শুরু করল হায়দারাবাদে। তারা শুরু করল ব্যাপক লুটতরাজ। মুসলমানদের ওপর চালানো হলো ভয়ংকর নিস্পেষণ। শত শত মুসলমান নিহত হলো এদের হাতে। লুটপাট, অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে হায়দারাবাদজুড়ে শুরু হলো ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা।

এই অ্যাকশন কমিটির সন্ত্রাস ঠেকাতে হায়দারাবাদ সরকার গ্রহণ করল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। সন্ত্রাসীরা পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হলো। আরিফুল হক এই ঘটনার তুলনা করেছেন বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী হামলা ও দখল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে।

স্বামী রামানন্দের এই আইন অমান্য আন্দোলনে হায়দারাবাদের ক্ষয়ক্ষতি হয় বিপুল। ১৯৪৮ সালের ২৯ নভেম্বর ভারতের *টাইমস অব ইন্ডিয়া* পত্রিকায় লেখা হয়—'বিদ্রোহীরা হায়দারাবাদের ১৭৫টি পুলিশফাঁড়ির ওপর আক্রমণ করেছে। ১২০টি স্থানে উপড়ে ফেলেছে রেললাইন। ৬১৫টি কাস্টমস ও পুলিশ ঘাঁটি ধ্বংস করেছে।'

দেশ ও জাতির সেই চরম সংকটকালে হায়দারাবাদের মুসলিমরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। আসলে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর কার্যকলাপ এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে; দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিজেদের জানমাল রক্ষার জন্য তাদের সংগঠিত না হয়ে আর উপায় ছিল না। তারা তিনটি বিষয়কে তাদের চিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত করেন। এক. দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা। দুই. মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে, তা দূর করা। তিন. হিন্দু সম্প্রদায় যেভাবে ভারতীয় হিন্দু মানসিকতায় ক্রমাগত আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, তা থেকে তাদের বের করে এনে রাষ্ট্রের মূল চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।

এই তিনটি লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে হায়দারাবাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদ বাহাদুর ইয়ার জঙ্গের নেতৃত্বে গঠিত হলো 'ইত্তেহাদুল মুসলেমিন' বা মুসলিম

https://nagorikpathagar.org

ঐক্য। ইতিহাসে যা 'ইত্তেহাদ' নামে পরিচিত হয়ে আছে। বাহাদুর ইয়ার জং ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। তিনি ইত্তেহাদকে অতি দ্রুত একটি বিশাল রাজনৈতিক দলে পরিণত করলেন। তারপর 'বাঁচাও হায়দারাবাদ, রুখো ভারত' শ্লোগানকে সামনে রেখে চষে বেড়াতে লাগলেন সারা দেশ। তিনি সভা, সেমিনার, র‍্যালিসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ড নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো, রণাঙ্গনের বীর সেনাপতির মতো ছুটে বেড়াতে লাগলেন।

বাহাদুর ইয়ার জঙ্গের প্রগতিশীল নেতৃত্বে হায়দারাবাদের জনজীবনে দেখা দিলো প্রাণচাঞ্চল্য। যারা সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন, তারা আবার সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে শুরু করলেন। যারা ধরেই নিয়েছিলেন স্বাধীন হায়দারাবাদের অস্তিত্ব বুঝি আর রক্ষা করা গেল না, ভারতীয় আক্রমণ আসন্ন; তাদের আশাহীন, ভাষাহীন, দিশাহীন বুকে আবার জ্বলে উঠল আশার আলো। সব প্রকার হতাশা, ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে তারা দলে দলে সমবেত হতে থাকল ইত্তেহাদের পতাকাতলে। সাধারণ হিন্দু জনগণের মধ্যে লাগামছাড়া প্রচার-প্রোপাগান্ডার ফলে ভারত ও তাদের দালালদের সৃষ্ট যে ভারত-আচ্ছন্নতা দেখা দিয়েছিল, তাও কেটে যেতে শুরু করল।

বাহাদুর ইয়ার জং ঘোষণা করলেন, হায়দারাবাদ শুধু মুসলমানদের মাতৃভূমি নয়, হায়দারাবাদ শুধু হিন্দুদের মাতৃভূমি নয়; হায়দারাবাদ হিন্দু-মুসলিমনির্বিশেষে সবার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাতৃভূমি। হায়দারাবাদের মানুষ হিন্দু নয়, তারা মুসলমান নয়, তারা সবাই হায়দারাবাদী। সেই হায়দারাবাদ আজ আক্রান্ত। তার স্বাধীন অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। তার স্বাধীনতাকে কেড়ে নেওয়ার জন্য ভারত আজ সর্বশক্তি নিয়ে চালাচ্ছে নানা জটিল-কুটিল ষড়যন্ত্র। এই রকম অবস্থায় ধর্ম-বর্ণ-গোত্রনির্বিশেষে সবাই ঐক্যবদ্ধ হোন। এগিয়ে আসুন মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে যদি আমাদের প্রাণ যায়, তাহলে আমরা শহিদের মর্যাদা পাব। দেশপ্রেম হলো ঈমানের অঙ্গ। সেই ঈমান পরীক্ষার সময় আজ সমাগত। মনে রাখবেন, গোলামির চেয়ে শহিদি দরোজা অনেক ঊর্ধ্বে। মাতৃভূমির স্বাধীনতার সংগ্রামের চেয়ে আর কোনো মূল্যবান জিনিস নেই পৃথিবীতে। যারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এখনও ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তা করছে তারা অভিশপ্ত। তারা হিন্দুদের শত্রু, মুসলমানদের শত্রু, তারা হায়দারাবাদের শত্রু। এই শত্রুদের চিহ্নিত করে, তাদের সৎপথে এনে, তাদের দেশসেবায় লাগানোও আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ। যারা সৎপথে আসবে না, তাদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে,

https://nagorikpathagar.org

নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। কারণ, এই ভারতীয় অনুচরদের মুক্তভাবে কর্মকাণ্ড চালাতে দেওয়ার অর্থ হবে হায়দারাবাদকে ভেতর থেকে বিপন্ন করে দেওয়া। দেশ ও জাতির চরম সংকটে সমাজের সব স্তরের মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে সিসাঢালা জাতীয় সংস্কৃতি। এই সংহতি দিয়েই আমরা আগ্রাসনবাসী ভারতীয় উচ্চাভিলাষ ব্যর্থ করে দেবো।

বাহাদুর ইয়ার জঙ্গের এই বক্তব্য সেদিন স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ল দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত। দেশজুড়ে দেখা দিলো অভূতপূর্ব গণজাগরণ। যেখানেই বাহাদুর ইয়ার জঙ্গের সভা-সমাবেশ, সেখানেই ঢল নামতে থাকল মানুষের। বহুদিন পর মানুষ যোগ্য একজন নেতাকে পেয়ে আশ্বস্ত হলো, আনন্দিত হলো। হায়দারাবাদ রক্ষার শপথ নিয়ে তারা নেমে এলো রাজপথে।

এই রকম টগবগে পরিস্থিতিতে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এলো সেই দুঃসংবাদ। আকস্মিকভাবে হায়দারাবাদে এক বন্ধুর বাসায় নৈশভোজে অংশ নিতে গিয়ে ইন্তেকাল করেছেন জননেতা বাহাদুর ইয়ার জং। বিপন্ন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল হায়দারাবাদের মানুষ। সারাদেশ যেন শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিল। অফিস-আদালত, মিল-কারখানা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলো লাখ লাখ শোকার্ত মানুষ। তাদের চোখে অশ্রু, কণ্ঠে বিলাপধ্বনি।

হায়দারাবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাহাদুর ইয়ার জঙ্গের মৃত্যুতে। এ প্রসঙ্গে *THE TRAGEDY OF HYDERABAD* গ্রন্থে মীর লায়েক আলি লেখেন—

> The funeral of Bahadur Yar Jung drew a crowd such as was never before witnessed in Hyderabad. There were people of all casts and creeds and, on both sides of the miles long procession, the house roofs and windows were packed with spectators. Perhaps there was not the tiniest shop in the whole city that had remaind open. There was sorrow all over.

একটা প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত। সত্যি সত্যি কি বাহাদুর ইয়ার জঙ্গের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল নাকি ঠান্ডা মাথায় অত্যন্ত সুকৌশলে হায়দারাবাদের এই মহানায়ককে হত্যা করেছিল ভারত? পরে যা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেভাবে স্বাভাবিক দুর্ঘটনা বলে চালানো হয়েছিল সিকিমের চোগিয়ালের ছেলের মৃত্যুর ঘটনাকে? নাকি রাজা বীরেন্দ্র যেভাবে সপরিবারে নিহত হন, সে রকম কিছু? আমরা জানি না।

https://nagorikpathagar.org

ভারতীয় ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে বাহাদুর ইয়ার জং জনগণের মন থেকে দূর করে দিয়েছিলেন সব ধরনের ভয়ভীতি ও হতাশা। সৃষ্টি করেছিলেন শক্তিশালী জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আশার আলো। এ রকম পরিস্থিতিতে তার আকস্মিক মৃত্যুর ফলে হায়দারাবাদ পরিণত হয়েছিল এক খণ্ড শোকের পাথরে। স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল জনসাধারণ। তাঁর মৃত্যুরে পর ইত্তেহাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষ।

সেই সংকটকালে হায়দারাবাদের মানুষের সামনে আলোকবর্তিকার মতো উদিত হন অপেক্ষাকৃত তরুণ জননেতা, দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ও সাহসী মানুষ হিসেবে পরিচিত কাশেম রিজভী। বাহাদুর ইয়ার জঙ্গের মৃত্যুর সুযোগে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে ভারত হায়দারাবাদের পরিস্থিতি করে তোলে আরও অস্থির এবং আরও উত্তপ্ত। হায়দারাবাদের মানুষের সামনে ভারত দাঁড় করিয়ে দেয় দুটি পথ—হয় দেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে ভারতভুক্ত হয়ে অধীনতা স্বীকার করে শান্তিতে বাস করো, অথবা স্বাধীনতা নিয়ে থাকার চেষ্টা করো। সে চেষ্টাও আমরাই বানচাল করে দেবো। অর্থাৎ যেদিক দিয়েই এগোতে থাকো, ভারতভুক্ত তোমাদের হতেই হবে, নইলে নিস্তার পাবে না।

হায়দারাবাদের মানুষ বিশেষ করে মুসলিম জনতা তখন টগবগ করে ফুটছে। রাজধানীসহ সারা দেশে আওয়াজ উঠেছে একটাই—'রুখো ভারত, বাঁচাও হায়দারাবাদ।' হায়দারাবাদের ওপর ভারতের আগ্রাসন ঠেকানোর জন্য সাধারণ মানুষ যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হচ্ছিল।

এদিকে কংগ্রেসের চর ও স্বেচ্ছাসেবকরা সীমান্ত অতিক্রম করে নতুন করে শুরু করে দিয়েছিল হাঙ্গামা। দুই হাজার মাইলব্যাপী বিস্তৃত হায়দারাবাদ-ভারত সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় সন্ত্রাসীরা হায়দারাবাদের ভেতরে ঢুকে শুরু করে দিয়েছিল বর্গির হাঙ্গামা। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, লুট, খুন, অগ্নিসংযোগ—এসব হয়ে পড়েছিল নৈমিত্তিক ঘটনা।

https://nagorikpathagar.org

এই অনুপ্রবেশকারীদের হায়দারাবাদের ভেতরকার কিছু মানুষ জোগাতে থাকল মদত। যেকোনো ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালানোর ক্ষেত্রে ভারতীয় চরদের বড়ো সহায়ক হয়ে দাঁড়াল কট্টর হিন্দুত্ববাদী স্বামী রামানন্দ তীর্থ। তিনি সীমান্ত অঞ্চলকে ফ্রি জোন ঘোষণা করে হায়দারাবাদকে ভারতে মিশে যাওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। তার ছত্রছায়ায় কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো প্রকাশ্যে সভা-সমাবেশ করে ভারতভুক্তির জন্য প্রচারণা চালাতে লাগল। এসব কর্মকাণ্ড পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছিল।

কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর পাশাপাশি কংগ্রেস আরও একটি অস্ত্র প্রয়োগ করল হায়দারাবাদে। এই অস্ত্রের নাম কম্যুনিস্ট। হায়দারাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কংগ্রেসের উসকানিতে কম্যুনিস্টরা রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেয়।

কম্যুনিস্টদের অস্ত্রশস্ত্র সবই সরবরাহ করত ভারত। ভারত সরকার-কংগ্রেসের উৎসাহ, উসকানি ও সাহায্য নিয়ে তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কম্যুনিস্টরা শুরু করে সশস্ত্র বিদ্রোহ। ইতিহাসে কম্যুনিস্টদের এই সশস্ত্র সংগ্রাম 'তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ ছিল নামেই কম্যুনিস্ট ও কৃষক বিদ্রোহ। মূলত এটা ছিল অনেকাংশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনাশের চক্রান্ত। যে চক্রান্তে কম্যুনিস্টরা বোকার মতো ভারতীয় দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

হায়দারাবাদ সরকার এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সচেষ্ট হলো। কিন্তু ততদিনে তেলেঙ্গানার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। বিদ্রোহীদের হাতে ভারত তুলে দিয়েছিল ভারী ভারী যুদ্ধাস্ত্র। অন্যদিকে হায়দারাবাদের পুলিশের হাতে ছিল সেকেলে বন্দুক। পুলিশ বিদ্রোহীদের সামনে অসহায় হয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহীরা পুলিশদের হটিয়ে দিয়ে দখল করে নিচ্ছিল একের পর এক গ্রাম। আর উচ্ছেদ করছিল বেছে বেছে মুসলমানদের। এভাবে মুসলমানরা সর্বস্ব হারিয়ে শরণার্থীর মতো জমা হতে থাকল রাজধানীতে। বিদ্রোহীরা প্যারালাল সরকার চালু করে আদায় করতে থাকল খাজনা-ট্যাক্স ইত্যাদি। বিষয়টির সঙ্গে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের তথাকথিত শান্তি বাহিনীর গঠন, লালন-পালন ও লাইন অভ অ্যাকশনের হুবহু মিল দেখা যায়।

শেষ পর্যন্ত তেলেঙ্গানার বিদ্রোহ দমন করার জন্য হায়দারাবাদ সরকার সেনাবাহিনী তলব করল। সেনাবাহিনীও বিদ্রোহ দমনে নেমে হিমশিম খেতে লাগল। সেনাবাহিনী দুভাবে আক্রান্ত হলো। এক. সম্মুখ সমরে বিদ্রোহীদের অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র। দুই. ভারতীয় মিডিয়ার লাগামহীন বিরতিহীন প্রচারণা।

https://nagorikpathagar.org

ভারতীয় মিডিয়াগুলো এমন ভাষায় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাল, যে কেউ বুঝে নিতে পারবে হায়দারাবাদের সেনাবাহিনী রক্তপিপাসু, তারা হিন্দুদের বাড়িঘর লুট করছে, তাদের খুন করছে। হিন্দু নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন করছে। যেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য কাজ করতে নেমে আক্রমণের শিকার হয়েছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। প্রতিদিন ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো মিথ্যা, উদ্দেশ্যমূলক, বানোয়াট ও কল্পকাহিনি প্রচার করে নিজ দেশের জনগণের পাশাপাশি বিশ্ব জনমতকেও বিভ্রান্ত করেছিল।

পরিস্থিতির এই পর্যায়ে আবারও এগিয়ে এলো ইত্তেহাদ। ইত্তেহাদের নেতারা ঠিক করলেন, আক্রান্ত মুসলিম এবং হায়দারাবাদের ধর্ম-বর্ণ-গোত্রনির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণকে সংগঠিত করে, তাদের আত্মরক্ষামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলবেন দেশরক্ষার জন্য প্রতিরোধ বাহিনী। ইত্তেহাদের নেতারা বাহাদুর ইয়ার জং প্রদর্শিত পথ ধরে নেমে পড়লেন সর্বসাধারণের মধ্যে। তারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে জনগণকে ভীতি ও আতঙ্ক কাটিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাতে লাগলেন। জনগণকে সংগঠিত করে আত্মরক্ষা তথা দেশরক্ষায় এগিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। তারা জনগণকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন।

ইত্তেহাদের নবীন নেতা কাশেম রিজভীর এই কর্মকাণ্ড হায়দারাবাদের সরকারও প্রথম দিকে ভালোভাবে নিতে চায়নি। কিন্তু কাশেম রিজভী রাজধানীতে আয়োজিত লক্ষাধিক জনতার এক সভায় ঘোষণা করলেন, হায়দারাবাদ আজ ভারত দ্বারা আক্রান্ত। সীমান্তের ওপারে ভারত ওত পেতে বসে আছে একটি মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায়। এরই মধ্যে সীমান্তে তাদের লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীরা চালাচ্ছে ব্যাপক নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড। তেলেঙ্গানায় কম্যুনিস্টরা ভারতের মদতপুষ্ট হয়ে শুরু করেছে রক্তাক্ত বিদ্রোহ। রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে আরেকটি রাষ্ট্র। স্বামী রামানন্দ তীর্থ প্রকাশ্যে খোদ রাজধানীতে এসে মাতৃভূমির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছেন নানা ষড়যন্ত্র। তিনি প্রতিনিয়ত হিন্দু ভাইদের উৎসাহিত করছেন ভারতভুক্তির পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য। তিনি হিন্দু সন্ত্রাসী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে একত্রিত করার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। মোটকথা, হায়দারাবাদ আজ ঘরে-বাইরে আক্রান্ত। এই চরম ক্রান্তিকালে কোনো দেশপ্রেমিক শক্তি ঘরে বসে থাকতে পারে না। বসে থাকা উচিত নয়। যার যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে আজ পথে নামতে হবে। দেশরক্ষার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এ কাজে গাফিলতির ফল হবে মারাত্মক। আমি সেজন্য জনগণকে বলব, মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায়

https://nagorikpathagar.org

সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন। হায়দারাবাদের প্রতিটি ঘরকে এক একটি দুর্গে পরিণত করতে হবে। যদি ভারত সরাসরি হায়দারাবাদ আক্রমণ করে, তাহলে প্রতিটি ঘর থেকে নেমে আসবে প্রতিরোধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লেলিনগ্রাদ-স্টালিনগ্রাদের মতো পথে পথে আমরা যুদ্ধক্ষেত্র বানাব। হায়দারাবাদ রক্ষার দায়িত্ব একলা নিজাম বা সরকারের নয়, হায়দারাবাদের প্রতিটি মানুষের। সেই দেশরক্ষার সংগ্রামে আসুন সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি। দেশরক্ষার ইতিহাসে যোগ করি এক নতুন ইতিহাস।

কাশেম রিজভীর এই উদাত্ত আহ্বানে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হলো দেশের মানুষ। সরকারও তাদের প্রতি সহমর্মী হয়ে উঠল। ফলে প্রণীত হতে থাকল এক সফল প্রতিরোধ কাহিনি। জননেতা কাশেম রিজভীর সুযোগ্য নেতৃত্বে আবার আশার আলো দেখতে পেল দেশের মানুষ। হায়দারাবাদের প্রতিটি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তরুণ ও যুবকরা। তাদের মধ্য থেকে কলেজ ছাত্রদের নিয়ে এই জননেতা গড়ে তুললেন এক শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। এই বাহিনীর নাম রাখা হলো 'রাজাকার বাহিনী'। বাংলাদেশে যে অর্থে 'রাজাকার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, ঠিক তার উলটো অর্থে গঠিত হয়েছিল হায়দারাবাদের রাজাকার বাহিনী। হায়দারাবাদের রাজাকার বাহিনী মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করে পথে নেমেছিল। তারা কারও দালাল ছিল না; বরং দালালদের প্রতিরোধ করাই ছিল তাদের কাজ।

শারীরিক সামর্থ্য ও শিক্ষার মান অনুযায়ী কাশেম রিজভী রাজাকার বাহিনীর বিভিন্ন ডিভিশন গড়ে তুললেন। দেখতে দেখতে ঝড়ের দ্রুততায় রাজাকার বাহিনীতে যোগদানের জন্য লোকজন ছুটে আসতে লাগল। কাশেম রিজভী প্রথমেই এই বাহিনীকে পাঠালেন সীমান্তে। বিভিন্ন সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উৎপাত ও লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধে এই বাহিনী দেখাল চমৎকার কৃতিত্ব। তারা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সব ধরনের অনুপ্রবেশ রোধ করে গড়ে তুলল প্রবল প্রতিরোধ ও সুপ্রশিক্ষিত ভারতীয় বাহিনী এবং তাদের লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রাজাকার বাহিনীর এই সাফল্যের কথা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। সেইসঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সংগঠক কাশেম রিজভীর সুনাম। তারপর এই রাজাকার বাহিনী এগিয়ে গেল তেলেঙ্গানার দিকে। ২ লাখ রাজাকার তেলেঙ্গানায় সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেয় ভারত ও কম্যুনিস্টদের যৌথভাবে পরিচালিত অন্যায় বিদ্রোহ। এই সময় ইত্তেহাদের সদস্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৯ লাখে। পুরো হায়দারাবাদ যখন রাজাকার বাহিনীর সাফল্যে উৎসব পালন

https://nagorikpathagar.org

করছে, মানুষের মনে ফিরে এসেছে শান্তি ও বিশ্বাস, সেই সময় আবার নতুন খেলা শুরু করল ভারতীয় মিডিয়া-সংবাদপত্র। এক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রগামী ছিল *হিন্দুস্তান টাইমস*।

বাংলাদেশের মানুষকে সাম্প্রদায়িক বানানোর জন্য দেশে-বিদেশে ভারত যেভাবে ব্যয় করে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার, তৈরি করে ফিল্ম, রচনা করে গ্রন্থ, মাঠে নামায় নানান নামের সংগঠন ও তথাকথিত 'সুশীল সমাজকে'—সেই একই রকমভাবে রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণায় দক্ষ ও কুশলী ভারতীয় প্রচারমাধ্যম নানা বানোয়াট গল্প তৈরি করে, তাতে রং চড়িয়ে প্রচার করতে লাগল তাদের খুন, লুট ও অত্যাচারের নানা কল্পিত কাহিনি। এসব গণমাধ্যমপ্রচার করতে থাকল যে, ভারত হায়দারাবাদ আক্রমণ করলে রাজাকাররা হিন্দুদের কচুকাটা করবে। তারা প্রচার করতে লাগল, হায়দারাবাদের হিন্দুদের জানমালের কোনো নিরাপত্তা নেই। এভাবে একতরফা অপপ্রচার চালিয়ে ভারত হায়দারাবাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে সক্ষম হলো। প্রস্তুত করে ফেলল আগ্রাসনের ক্ষেত্র।

ভারতীয় মিডিয়ার এসব কল্পকাহিনি ও মিথ্যা প্রচারণার সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে দলে দলে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও পত্রিকার সাংবাদিকরা ছুটে এলো হায়দারাবাদে। তারা চষে বেড়ালেন হায়দারাবাদ। কথা বললেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে। তারা কেউই ভারতীয় প্রচারণার সত্যতা কোথাও খুঁজে পেলেন না। নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তারা ভারতীয় প্রচারণার মিথ্যাচার খণ্ডন করে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট প্রকাশ করলেন। তাদের প্রতিবেদন পাঠ করে জাতিসংঘসহ ইউরোপ-আমেরিকার সরকার ও সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত হলো। কিন্তু বড়োই নাখোশ হলো ভারত ও তাদের মিডিয়া মহল। তারা সভ্যতা, সৌজন্য ও সৎ সাংবাদিকতার সব গণ্ডি অতিক্রম করে নির্লজ্জভাবে প্রচারণা চালাল যে, ইউরোপ ও আমেরিকার ওইসব সাংবাদিকরা হায়দারাবাদ সরকারের কাছ থেকে প্রচুর ঘুস খেয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

জননেতা কাশেম রিজভীর নেতৃত্বে ২ লাখ রাজাকার এবং ইত্তেহাদের ৯ লাখ জানবাজ সদস্যের প্রাণপণ প্রচেষ্টার ফলে অচিরেই তেলেঙ্গানার বিদ্রোহ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে এলো। বন্ধ হয়ে গেল সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য ও সন্ত্রাসীদের অনুপ্রবেশ। দেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় মদতে গোলযোগ সৃষ্টির সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলো এই সম্মিলিত বাহিনী। একই সঙ্গে দাবি উঠল শতাব্দীকাল ধরে হায়দারাবাদের সেকেন্দ্রাবাদে যে ভারতীয় সৈন্য ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে এবার তাদের পাততাড়ি গোটাতে হবে।

ভারতের জন্য সময়টা খুবই বিব্রতকর; একই সঙ্গে অস্বস্তির ছিল। কারণ, তাদের গোপন সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য দরকার হয়ে পড়েছিল সময়। তা ছাড়া অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বাঁধিয়েই যদি দেশটাকে কবজা করা যায়, তাহলে সব দিক দিয়েই সুবিধা হতো ভারতের। সেক্ষেত্রে বহির্বিশ্বকে প্রভাবিত করা তাদের জন্য সহজ হতো। সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছিল ভারতীয় বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা। কিন্তু কাশেম রিজভীর সুযোগ্য নেতৃত্ব অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন করে রাষ্ট্রীয় সংহতি ও জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করে ফেললে বেকায়দায় পড়ে যায় ভারত। এই অবস্থায় হায়দারাবাদ সরকার যখন STANDSTILL AGREEMENT-এর প্রস্তাব উত্থাপন করে তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেদের একটা ক্লিন ইমেজ বহির্বিশ্বে দেখানোর জন্য ভারত চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত হয়। যদিও হায়দারাবাদ বিশেষজ্ঞ আজিজ রিজভী তার *BETRAYAL* গ্রন্থে বলেছেন—'It was actually a no-win situation both for the Nizam and the Indians. Just peace for one year.'

কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেল, নেহরু এবং ভারত সরকার কি এই এক বছরের শান্তি চুক্তি মেনে নেবে? মেনে নিক আর না নিক, হায়দারাবাদের সাধারণ মানুষের মধ্যেও একধরনের স্বস্তি ফিরে এলো। ভারত যে এই চুক্তির মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত হায়দারাবাদের স্বাধীনতাকে মেনে নিল, সেই অনুভব থেকে হায়দারাবাদের সর্বত্র আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। এই স্ট্যান্ডস্টিল চুক্তির শর্ত অনুযায়ী দুই দেশের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার জন্য হায়দারাবাদের সাবেক

https://nagorikpathagar.org

গণপূর্ত মন্ত্রী এবং খ্যাতনামা স্থপতি নবাব ইয়ার জংকে দিল্লিতে প্রতিনিধি নিয়োগ করলেন নিজাম, অপরপক্ষে ভারত সরকার গুজরাটের ঝানু রাজনীতিবিদ, লেখক ও বোম্বের এককালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেএম মুন্সীকে হায়দারাবাদে ভারতীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করল। এই কেএম মুন্সী সেই লোক, যিনি এর আগে হায়দারাবাদে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টির জন্য নানা অপকর্ম করে হাত পাকিয়েছিলেন। কেএম মুন্সীর ব্যাপারে মৃদু আপত্তি উঠলেও তা ধোপে টিকল না। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ভারত সরিয়ে নিল তাদের সেনাবাহিনী। হায়দারাবাদের আকাশের মেঘ কিছুটা যেন সরে গেল।

এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই প্রধানমন্ত্রী ছতরী হায়দারাবাদ ছেড়ে চলে গেলেন। তার স্থলে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন রাজনীতিবিদ, প্রকৌশলী স্যার মীর লায়েক আলি। এই মীর লায়েক আলিই পরবর্তীকালে প্রণয়ন করেন বিখ্যাত গ্রন্থ *The Tragedy of Hyderabad*। সে বই তিনি উৎসর্গ করেছিলেন এবাবে—'The book is dedicated to those tens of thousands dead and many more still silently suffering for their struggle in the cause of Hyderabad.' ১৯৬২ সালে পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড করাচি থেকে বইটি প্রকাশ করে।

স্ট্যান্ডস্টিল চুক্তি যে ভারত মোটেই মেনে নেয়নি, অচিরেই তার প্রমাণ মিলতে লাগল। ভারত খুঁজতে শুরু করল নানা ওসিলা। শাস্ত্রের কথাই সত্য প্রমাণিত হলো। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। ভারতেরও তেমনি চুক্তি ভঙ্গ করতে ছলনার অভাব হলো না। বাকি অংশ আরিফুল হকের বর্ণনা থেকে তুলে দিচ্ছি।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পরে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংকের অংশ হিসেবে পাকিস্তানের প্রাপ্য হয় ৫০ কোটি টাকা। মাউন্ট ব্যাটেন যথারীতি তখনও ভারতের গভর্নর জেনারেল। পাকিস্তান তার প্রাপ্য টাকা দাবি করলে ভারত বেঁকে বসল। ভারত পাকিস্তানের ন্যায্য টাকা পরিশোধ করতে অস্বীকার করল। সে সময় এই বিষয়টি নিয়ে বিশ্বজুড়ে তোলপাড় শুরু হলেও ভারত তাতে কর্ণপাত করেনি। একপর্যায়ে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত পাকিস্তানের ন্যায্য টাকা পরিশোধ করার জন্য সরকারকে চাপ দিলেন। তাতেও নেহরু-প্যাটেল এবং মাউন্ট ব্যাটেন চক্রকে তাদের সিদ্ধান্ত থেকে টলানো গেল না।

নিদারুণ অর্থকষ্টে পাকিস্তানের তখন ঘোর দুর্দিন। একপর্যায়ে সে অস্তিত্ব হারাতে বসে। সেই সংকটকালে পাকিস্তানের পাশে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয় স্বাধীন হায়দারাবাদ। হায়দারাবাদ সরকার দ্রুততার সঙ্গে পাকিস্তানকে ২০

https://nagorikpathagar.org

কোটি টাকা ঋণ দিয়ে সাহায্য করে। এই সাহায্যের ফলে পাকিস্তান একটু দম নেওয়ার ফুরসত পায়। পাকিস্তানকে এই ঋণ দেওয়ার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ভারত অত্যন্ত কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ভারত কড়া ভাষায় হায়দারাবাদকে জানিয়ে দেয়, পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়ার বিষয়টি ভারতের সঙ্গে সরাসরি শত্রুতার শামিল। এটা দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত স্ট্যান্ডস্টিল চুক্তির পরিপূর্ণ বরখেলাপ। ভারত শুধু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেই তার কাজ শেষ করল না, হায়দারাবাদের ওপর আরোপ করল সর্বমাত্রিক অবরোধ।

প্রথমেই জারি করা হলো বিমান অবরোধ। হায়দারাবাদের ডেকান এয়ারওয়েজের বিমানকে হায়দারাবাদ হয়ে বোম্বে, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, দিল্লিতে চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হলো। তারপর হায়দারাবাদের রেলওয়ের গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক এক্সপ্রেসকে ভারতে চলাচল নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। তারপর ভারতের সঙ্গে হায়দারাবাদের সব ধরনের টেলিসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো।

ভারতবেষ্টিত হায়দারাবাদের তখন প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার মতো অবস্থা। এই রকম অবস্থায় হায়দারাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় প্রতিনিধি কেএম মুন্সী সব কূটনৈতিক শিষ্টাচার ও রীতিনীতি ভেঙে হায়দারাবাদের সীমান্ত এলাকাগুলোতে নিয়মিত সফর শুরু করলেন। তিনি তার সফরের প্রতিটি পর্যায়ে জনসমাবেশ করতে লাগলেন। জনগণকে বোঝাতে শুরু করলেন ভারতের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে। এই সফরের একপর্যায়ে বিজয়ওয়াড়ায় আয়োজিত এক প্রকাশ্য সভায় তিনি সদম্ভে ঘোষণা করলেন—'হায়দারাবাদ রক্তে-মাংসে ভারতের সঙ্গে মিশে আছে। দু-দেশের জনগণ এক ও অভিন্ন। তাদের সংস্কৃতিও অভিন্ন।' [ঠিক যেভাবে কদিন আগে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে বলেছিলেন—দু-দেশের জনগণের রয়েছে অভিন্ন ইতিহাস। তাদের সংস্কৃতিও অভিন্ন]

মুন্সীর এই ভব্যতাবর্জিত বক্তব্যের বিরুদ্ধে ভারতের কাছে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন দিল্লির হায়দারাবাদের প্রতিনিধি নবাব ইয়ার জং। হায়দারাবাদের প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলি অবরোধের বিষয়ে আলোচনার জন্য শাটল ককের মতো ছোটাছুটি করলেন হায়দারাবাদ থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে হায়দারাবাদ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং ভিপি মেননের সঙ্গে আলোচনার পর আলোচনা চালিয়ে গেলেন। কিন্তু ভারত একেকবার একেক অজুহাত খাড়া করে সবগুলো আলোচনাকেই ভন্ডুল করে দিলো। কোনো সমাধান পাওয়া গেল না। হায়দারাবাদের প্রতিনিধি ছুটলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে।

https://nagorikpathagar.org

মাউন্ট ব্যাটেনের সঙ্গে দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা ধরে টানা বৈঠক করলেন মীর লায়েক আলি। কিন্তু কোনো যুক্তির ভাষাই গ্রাহ্য হলো না মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে। উলটো মীর লায়েক আলিকে ভীতি প্রদর্শন করে এই সাদা চামড়ার 'ভারতবাদী' বললেন, 'আমি কয়েক দিন পরই ভারত ত্যাগ করে চলে যাব। সুতরাং ভারত যদি হায়দারাবাদে সেনা অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়; সেক্ষেত্রে হায়দারাবাদের সেনাবাহিনী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।'

মীর লায়েক আলি মাউন্ট ব্যাটেনের এই কথার জবাবে বললেন—'এ কথা ঠিক যে হায়দারাবাদ সেনাবাহিনীর অবস্থান আমাদের বিজয়ের অনুকূলে নয়। তথাপি আমি বলব, হায়দারাবাদের রাষ্ট্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব বিসর্জন দিয়ে ভারতের সঙ্গে মিশে যাওয়া আমাদের জন্য দশ গুণ নীচতার কাজ হবে।'

মোটকথা, ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। ভারত হায়দারাবাদ দখলের সব পরিকল্পনা শেষ করে সামরিক অভিযান শুরুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এর আগেই ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে হায়দারাবাদের চারদিকে বিপুল সেনা সমাবেশ ঘটিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে ঘোষণা করেছিলেন, হায়দারাবাদের সামনে এখন দুটি পথ খোলা আছে—'হয় পথে ফিরে আসো, নয়তো যুদ্ধ করো।'

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ তখন মৃত্যুশয্যায়। তিনি তখন কোয়েটার কাছে জিয়ারত স্বাস্থ্য নিবাসে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। সারা পাকিস্তানে তখন উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। কিন্তু হায়দারাবাদজুড়ে তার চেয়েও বেশি উদ্বেগ আর অস্থিরতা। মীর লায়েক আলির কাছে হায়দারাবাদ রক্ষার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মোকাবিলার পথই বেছে নেওয়া শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হলো। তিনি তড়িঘড়ি ছুটলেন করাচিতে। তারপর করাচি হয়ে কোয়েটা থেকে জিয়ারতে, মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর শয্যার পাশে।

https://nagorikpathagar.org

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা 'কায়দে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ' বলেছিলেন, যদি ভারত হায়দারাবাদের ওপর আক্রমণ চালায়, তাহলে সে পরিস্থিতিতে পাকিস্তান বসে থাকবে না। জিন্নাহর এই কথার পর দারুণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন নিজাম ওসমান আলি খান এবং প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলি। হায়দারাবাদের দুর্ভাগ্য সেই সময় জিন্নাহ ছিলেন মৃত্যুশয্যায়। কথা বলার মতো পরিস্থিতি তার ছিল না। আর পাকিস্তানের সেই সময়কার শাসকরা ছিলেন সিদ্ধান্তহীনতায়। তারা জিন্নাহর জীবদ্দশায় নিজেদের সিদ্ধান্ত দেওয়ার যোগ্য মনে করেননি।

তবুও জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে আলোচনার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে (১৯৪৮) রাতের আঁধারে ওত পেতে থাকা ভারতীয় রাডার ফাঁকি দিয়ে করাচিতে উড়ে চললেন মীর লায়েক আলি। সেই বিপজ্জনক উড়াল, হায়দারাবাদের ভাগ্য এবং পাকিস্তানি শাসকদের বোঝার জন্য মীর লায়েক আলির নিজের লেখা *THE TRAGEDY OF HYDERABAD* গ্রন্থের সরাসরি শরণাপন্ন হচ্ছি আমরা। কারণ, ওই গ্রন্থ শুধু কোনো গ্রন্থ নয়, ওটা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পীড়িত একটি সময়ের দলিল :

পাহারারত যুদ্ধবিমানের পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার মধ্যে একধরনের উত্তেজনা কাজ করে। এমনই একটি অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, যখন আমি এক জ্যোৎস্নালোকিত রাতে করাচি পৌঁছে আবার ফিরে আসার জন্য রওনা হয়েছিলাম একটি চার ইঞ্জিনযুক্ত লেনকেস্টার বিমানে করে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যদিও খুব একটা নিরাপদ ছিল না, তবুও বিমানের অন্য যাত্রীদের মধ্যে কোনো ভয় দেখা যাচ্ছিল না। তারা কেউ জানত না যে, আমি কে। তাই তারা নিশ্চিন্তে গল্পগুজব করছিল। বিমান থেকে বোমা হামলার ভয় তারা শুধু তখনই পেত, যখন তারা মাটিতে থাকত। কিন্তু যখন তারা আকাশে, তখন আশপাশের ভারতীয় বিমানের জন্য তাদের মধ্যে কোনো ভয় লক্ষ করা যাচ্ছিল না। যদিও তাদের নিজেদের রাডারের ওপর তাদের তেমন কোনো ভরসা ছিল না।

https://nagorikpathagar.org

হায়দারাবাদের জন্য এটা খেয়াল রাখা জরুরি ছিল যে, যদি ভারতীয় সেনারা তাদের ওপর হামলা চালায়, তবে পাকিস্তান কিছু একটা করবেই। কায়দে আজম জিন্নাহর বক্তব্যে এটা একাধিকবার প্রকাশ পেয়েছিল যে, যদি ভারত কোনো সশস্ত্র আক্রমণ চালায়, তবে পাকিস্তান বসে থাকবে না। তা সবই ভালো। কিন্তু এখন সময় এসেছে আরও পরিপক্ব পরিকল্পনার। এসব নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল করাচিতে অবস্থানরত হায়দারাবাদের এক জেনারেলের, যে কি না আমাকে বারবার অনুরোধ করে চলেছিল করাচিতে একবার আসার জন্য।

যদিও নিজাম খুবই চিন্তিত ছিলেন। কারণ, যাত্রাপথে অনেক বিপদ হতে পারত। কিন্তু যখন তিনি জানলেন যে, এ ব্যাপারে আমি মোটেও শঙ্কিত নই, তিনি আমাকে যাত্রা করার জন্য সম্মতি প্রদান করলেন। আমি তাকে নিশ্চয়তা দিলাম যে, আমি ফেরার সময় তার কিছু প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে আমার ভ্রমণের আয়োজন করা হলো। আমার মন্ত্রিসভার সদস্যরা পর্যন্ত আমার এই বিপজ্জনক ভ্রমণ সম্পর্কে কিছু জানতেন না। রওনা হওয়ার আগ মুহূর্তে বিষয়টি আমার পরিবারকে জানাই। আমার পরিবারের সবাই বুঝতে পেরেছিল যে, এটা খুবই একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কিন্তু তবুও তারা আমাকে সমর্থন জানায়। গভীর রাতে আমি এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হলাম, সেটাও ছিল অনেক দূরে। ঘর থেকে বের হওয়ার তিন ঘণ্টার মধ্যে আমি আকাশ পথে যাত্রা শুরু করলাম। সঙ্গে ছিল আমার এডিসি এবং খানসামা। আমি খুবই ক্লান্ত ছিলাম এবং ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বিমানটা যখন করাচি বিমানবন্দরের মাটি ছুঁয়েছে, তখন আমার ঘুম ভেঙেছিল। বিমানবন্দরের আশপাশে কেউই ছিল না। সেখানে একটি গাড়ি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি নিশ্চুপভাবেই গাড়িতে উঠে বসলাম। করাচিতে অবস্থানরত হায়দারাবাদের রাষ্ট্রদূত জেনারেল মোশতাক আহমেদ সেই গাড়িতে ছিলেন। তিনি আমাকে করাচিতে কী কী ঘটছে সব সংক্ষেপে জানালেন। আমি জানতে পারলাম যে, কায়দে আজম জিন্নাহ কোয়েটায় অবস্থান করছেন। শিগ্‌গিরই আমাকে কোয়েটার উদ্দেশে যাত্রা করতে হবে। আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে একটি বিমান রেডি করে রাখা হয়েছে।

গাড়ি আমাকে দ্রুতগতিতে নিয়ে চলল পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের বাসার দিকে। যেখানে তিনি আমার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

https://nagorikpathagar.org

খুব দ্রুত শেভ ও গোসল সেরে গোলাম মোহাম্মদের কাছে গেলাম কফি খাওয়া শেষে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার উদ্দেশ্যে। গোলাম মোহাম্মদ আমাকে নিয়ে বসলেন। তিনি আমাকে বিভিন্ন গোয়েন্দা রিপোর্ট শোনালেন এবং হায়দারাবাদের যোদ্ধাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জোগানের বিষয়ে আলাপ করলেন। তার মতে, ভারতীয় বাহিনীর বেশির ভাগ অংশই হায়দারাবাদে ও কাশ্মীর ঘিরে অবস্থান করছে। পাকিস্তানি বর্ডার থেকে ভারত তার বাহিনী সরিয়ে নিয়েছে এবং তা হায়দারাবাদের দিকে রওনা হয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি—যদি পাকিস্তান বাহিনী এখন ভারত আক্রমণ করে, তবে ব্যাপারটা কি রূপ ধারণ করবে? জবাবে তিনি বলেন, সেক্ষেত্রে ভারতীয় সেনারা হায়দারাবাদ পৌঁছতে পৌঁছতে আমরা দিল্লি পৌঁছে যাব। আমি তাকে সুনিশ্চিতভাবে বলতে বললাম, যদি ভারত হায়দারাবাদে আক্রমণ চালায়, তবে পাকিস্তান সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে কি না? তিনি উত্তর দিলেন—একমাত্র কায়দে আজমই এ বিষয়ে বলতে পারবেন। তবে তিনি বারবার আমাকে একটি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বলছিলেন যে, হায়দারাবাদের উচিত হবে যতটা সম্ভব তাদের টাকাপয়সা ও সম্পদ পাকিস্তানে ট্রান্সফার করে দেওয়া, যাতে পাকিস্তান এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সাহায্য করতে পারে।

অপচয় করার মতো কোনো সময় আমাদের হাতে ছিল না। কয়েক চুমুক কফি পান করে আমরা দুজনেই একটি বন্ধ গাড়িতে করে বিমানবন্দরের দিকে রওনা দিই। পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর একটি বিমান আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি আমার এডিসি ও খানসামাকে নিয়ে বিমানে উঠলাম। আমাকে জানানো হলো, কায়দে আজম জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কোয়েটা পৌঁছে জিয়ারতের উদ্দেশে রওনা হতে হবে। কোয়েটায় নামার পর জানতে পারলাম যে, আমাকে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে না। কারণ, দুদিন আগেই কায়দে আজম জিন্নাহ কোয়েটাতে ফিরে এসেছেন।

কায়দে আজম জিন্নাহর বাসভবনে পৌঁছতেই আমি সবার মধ্যে উদ্বেগ লক্ষ করলাম। সেখানে আমি দুই কি তিনজন ডাক্তারকে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় দেখলাম। আমাকে জানানো হলো, এক ঘণ্টা আগে তাকে কিছু ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে, যার ফলে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বর্তমানে কায়দে আজম জিন্নাহ খুবই কষ্টের মধ্যে আছেন। তিনি প্রায় অচেতন অবস্থার মধ্যে আছেন। কিছুক্ষণ পর মিস ফাতেমা জিন্নাহর সঙ্গে আমার দেখা হলো। তিনি আমাকে জানালেন যে, এমন আগেও হয়েছে। কিছু সময় পর তার অবস্থা

https://nagorikpathagar.org

উন্নতি হলে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারব। আমি পরবর্তী সময়গুলো মিস জিন্নাহর সঙ্গে কথা বলে কাটাই। তিনি বারবার কায়দে আজমের কক্ষে যাচ্ছিলেন আর ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছিলেন। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর শেষ পর্যন্ত মিস জিন্নাহ তার কাছে খবরটি পৌছাতে সক্ষম হলেন যে, আমি অনেকক্ষণ হয় এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং তার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করছি। মিস জিন্নাহ অনেকটা বিব্রতভাবে আমাকে জানালেন—জিন্নাহ আঙুল নাড়িয়ে ইশারা করেছেন, যার অর্থ এই যে, তিনি আর ব্যথা সহ্য করতে পারছেন না। আমার কাছে প্রতিটি মুহূর্তকে অসম্ভব ভারী বলে মনে হচ্ছিল। আমি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে পড়ছিলাম।

বেলা তিনটার দিকে আমি জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সব আশা ত্যাগ করলাম। আমাকে করাচি ফিরে যেতে হবে। সেখানে পরামর্শ করার পর আমাকে আবার হায়দারাবাদে ফিরে যেতে হবে এবং এসবই সম্পন্ন করতে হবে সকাল হওয়ার আগে। আমি তবুও আরও আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। অবশেষে খবর পেলাম যে, তার সেই মুহূর্তে সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তার কাছ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল পাওয়ার কথা ছিল; কিন্তু খবর পেলাম যে, কেউ দলিলগুলো সম্পর্কে অবগত নয়। ওগুলো জিন্নাহর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে রাখা আছে।

আমি হতাশ অবস্থায় ফিরে এলাম। করাচি বিমানবন্দরে পৌছার পর একটি গাড়ি আমাকে গোলাম মোহাম্মদের বাড়িতে নিয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি আমেরিকান দূতাবাস আয়োজিত একটি ডিনারে যাওয়ার পথে দেখা করতে এসেছিলেন। সেখানে তার উপস্থিতি না দেখা গেলে নানা সন্দেহ জন্মাবে। এসব বলে দ্রুত ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে চলে গেলেন।

লিয়াকত আলি খান ও গোলাম মোহাম্মদ অনেক দেরিতে ফিরলেন। সঙ্গে এলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরউল্লাহ খান এবং মোহাম্মদ আলি। আমি তাদের কায়দে আজম জিন্নাহর খারাপ অবস্থার কথা জানালাম। তারা শুনে খুব অবাক হলেন। কায়দে আজমকে লন্ডনে নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা নেওয়ারও কথা হলো। এরপর আমরা সবাই হায়দারাবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমরকৌশল এবং রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করলাম এবং পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের দ্বারা প্রাপ্ত রিপোর্ট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম।

জানতে পারলাম যে, ভারত প্লান করছে ২২ সেপ্টেম্বর হায়দারাবাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার। জাফরউল্লাহ খান জাতিসংঘের প্যারিস অধিবেশনে যাওয়ার

https://nagorikpathagar.org

প্রস্তুতিতে ছিলেন। তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেখানে তিনি এসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরবেন। আমি পাকিস্তানের কিছু বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র এবং অ্যান্টি ট্যাংক মাইন নেওয়ার কথা বললেন। কারণ, বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র পরিবহন করে কোথাও পাঠানো খুব কঠিন। ভারত হায়দারাবাদ আক্রমণ করলে পাকিস্তান কী করবে, তা আমি সরাসরি জানতে চাচ্ছিলাম তাদের কাছ থেকে। জাফরউল্লাহ খান আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ইউএনওর সিকিউরিটি কাউন্সিল একটা ব্যবস্থা নেবেই। কিন্তু ভারতীয় আগ্রাসন ঠেকাতে পাকিস্তান কী করবে, সে ব্যাপারে কেউই আমাকে একটি সোজাসুজি উত্তর দিলেন না। আমি অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি তাহলে ধরে নেব যে, এমতাবস্থায় পাকিস্তানের পুরোপুরি সমর্থন নেই? আমাকে উত্তর দেওয়া হলো, পাকিস্তান কী করবে তা কায়দে আজম জিন্নাহই একমাত্র বলতে পারবেন, আর কারও এ ব্যাপারে বলার সামর্থ্য নেই।

কথা চলতেই থাকল। ভারতের ক্ষমতা কতটুকু, হায়দারাবাদ ভারতের বিপক্ষে কতক্ষণ টিকতে পারবে, পাকিস্তান কী করবে, সিকিউরিটি কাউন্সিলের মতামত কী হতে পারে—এসব নিয়ে আলোচনা করতে করতে রাত ২টা বেজে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবার আমাকে যেতে হবে। আমি বিদায় নিয়ে বিমানবন্দরের দিকে রওনা দিলাম। দিনের আলো ফুটে বেরুবার আগেই আমাকে ভারতীয় টেরিটরি পার হয়ে যেতে হবে। নইলে ভয়ানক বিপদ হতে পারে। মুহূর্তের মধ্যেই আমি আবারও আকাশপথে যাত্রা শুরু করলাম।

দিনের আলো ফুটতেই বিমান হায়দারাবাদের মাটিতে অবতরণ করল। আমরা নিরাপদেই ভারতীয় রাডারকে ফাঁকি দিয়ে উড়ে আসতে পেরেছি। সেখানে একটি সামরিক গাড়ি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। গাড়িতে ওঠার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার আমাকে জানাল যে, তিনি খুশি হয়েছেন আমি আরও আগে পৌঁছাইনি। কারণ, একটু আগেই আকাশে কিছু ভারতীয় বিমান টহল দিয়ে গেছে।

বাড়িতে পৌঁছানোর কয়েক মিনিট পর কেএম মুন্সী আমাকে কল করলেন। তিনি হায়দারাবাদে ভারতের প্রতিনিধি জেনারেল ছিলেন। তিনি তার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাব দিলে আমি রাজি হলাম। সম্ভবত আমাকে আমার অফিস বা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে না দেখে আমার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই তিনি চালাকির সঙ্গে এটি করেছিলেন। এরপর আমি নিজামকে টেলিফোন করলাম এবং তার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে বের হলাম।

নিজাম আশাহত হয়েছিলেন জিন্নাহর শারীরিক অবস্থার কথা শুনে এবং আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি সেজন্য। তিনি আমার মতোই হতাশ ছিলেন।

https://nagorikpathagar.org

আমি তাকে জানালাম যে, তথ্য অনুযায়ী ভারতের আক্রমণের সময়সীমা ২০ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর। সেনাপ্রধানের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। আমরা জানতে আগ্রহী ছিলাম যে, হায়দারাবাদ ভারতকে কত সময় ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। তিনি জানালেন, রাজধানী পর্যন্ত পৌছাতে ভারতের প্রায় আট সপ্তাহ সময় লাগবে। তিনি চলে যাওয়ার পর আমি নিজামকে বললাম, এটা সন্তোষজনক। যদি চার সপ্তাহ ভারতকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, তাহলেও সেখানে আশা আছে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি ছিল জাতিসংঘে প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যাপারটা। কারা কারা যাবে সেসবের প্রস্তুতিও চূড়ান্ত করা হলো। ঠিক করা হলো যে, মঈন নওয়াজ জং হবেন প্রতিনিধিদলের প্রধান। রহিম, শ্রীপথ রাও, শ্যামসুন্দর এবং মীর নওয়াজ জং হবেন প্রতিনিধিদলের সদস্য। জহির আহমদকে করা হলো প্রতিনিধিদলের সচিব। ঠিক হলো তারা জাতিসংঘের উদ্দেশে ৯ সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) রাতে রওনা দেবেন।

আগের দিন বিকালে মঈন নওয়াজ খান নিজামের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটালেন। প্রতিটি বিষয় নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে কথা হলো। বলা হলো তার স্ত্রীও তার সঙ্গে যাবে। তারপর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বাড়ি ফিরে এল যাত্রার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। যাত্রা শুরুর আধা ঘণ্টা আগে আমি ফোন করলাম। তারা তাদের দুই শিশু সন্তানকে হায়দারাবাদে রেখেই চলে যেতে চাচ্ছিল। আমি অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললাম, কখন কী হয় কেউ জানে না। আপনি আপনার ছেলেমেয়ে দুটিকে সঙ্গেই নিয়ে যান। তারা বলল, এতে তাদের কাজের সমস্যা হবে। আমি বললাম, তবুও। অগত্যা রাজি হলো মঈন দম্পতি। আমি তাদের আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়ে বিদায় জানালাম।

এই ঘটনা ভারতীয় আক্রমণ শুরুর তিন দিন আগের। তখনও হায়দারাবাদ সরকারের ধারণা ২০ সেপ্টেম্বরের আগে ভারত আক্রমণ শুরু করবে না।

https://nagorikpathagar.org

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো খবরটি এসে পৌঁছল উত্তেজনায় অস্থির হায়দারাবাদে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা 'কায়দে আজম জিন্নাহ' আর নেই। সময়টা ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর।

মীর লায়েক আলি নির্ঘুম কাটালেন সারা রাত। নিজাম হয়ে পড়লেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কারণ, তিনি জাতিসংঘের চাইতেও বেশি নির্ভরশীল ছিলেন জিন্নাহর ওপর। সেই জিন্নাহর না থাকার অর্থ হায়দারাবাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো আর কেউ রইল না। কারণ, জিন্নাহবিহীন পাকিস্তানের তখন কিছু করার মতো তেমন আর কেউ ছিল না।

হায়দারাবাদের মন্ত্রিসভা পরিষ্কার বুঝে গেল, ২০ তারিখে নয়, হয়তো আগামীকাল ভোরেই আক্রমণ শুরু করবে ভারত। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইদরুসকে তা বোঝানো গেল না। তার ধারণা, ২০ সেপ্টেম্বরের আগে ভারত আক্রমণ শুরু করবে না। তা ছাড়া তার অতিরিক্ত উৎফুল্ল ভাব ও সেনা সন্নিবেশে নানা ত্রুটিতে উদ্বিগ্ন মন্ত্রিসভার পক্ষে প্রধানমন্ত্রী লায়েক আলি বিষয়টি নিজামের গোচরে আনলেন। বললেন সেনাপ্রধানের রহস্যময় আচরণ নিয়ে। নিজাম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত হলেন। কিন্তু তখন আসলেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর রাশ রাশ অস্থিরতাকে ধারণ করে হায়দারাবাদে আরেকটি সকাল হলো। মীর লায়েক আলির বর্ণনা এক্ষেত্রে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো সাক্ষী :

সকালে খবর পেয়ে অনেক স্বস্তি পেলাম, যে মঈন নওয়াজ এবং তার পরিবার নিরাপদেই করাচি পৌঁছেছে। আমি নিজামের সঙ্গে দেখা করলাম এবং আমরা তখনকার পরিস্থিতি ও পাকিস্তান কী করতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সেনাপ্রধানকে ডাকা হলো এবং তাকে আবারও জিজ্ঞাসা করা হলো—ভারতের আক্রমণ কতদিন পর্যন্ত ঠেকানো যাবে? সেনাপ্রধান সুনিশ্চিতভাবে বললেন যে, যত সৈন্য নিয়েই ভারত আক্রমণ করুক না কেন,

https://nagorikpathagar.org

আট সপ্তাহের আগে রাজধানীতে পৌঁছতে ব্যর্থ হবে। কথাটা তিনি দৃঢ়তার সাথে নয়, বললেন বেশ হাসিখুশিভাবে।

তা ছাড়াও আমি চিন্তিত ছিলাম যে, ভারতের কংগ্রেসের যেসব সদস্য আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করেছে এবং যারা কেএম মুন্সীর সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলত এবং তার আদেশ মানত, তারা কোনো চাল চালে কি না। দেশের মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে তখন পর্যন্ত কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয়নি, মাতৃভূমিকে রক্ষায় সবাই ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু কিছু হিন্দু বুদ্ধিজীবী ছিল ভারতের পক্ষে। আর কিছু মুসলমানও ছিল, যারা মুন্সীর কুবুদ্ধিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল। তখন একটা সম্ভাবনা ছিল যে, ভারতের চালে তারা দেশের ভেতর বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করবে। পান্নালাল নামে এক হিন্দু ও তার পরিবারকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম। কারণ, সে ভয়ে ছিল, যদি তার পরিবারের কোনো ক্ষতি করা হয়। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমরা কি হায়দারাবাদকে রক্ষা করতে পারব? আমি বলেছিলাম, আমি জানি না, কিন্তু আমরা হেরে গেলেও যুদ্ধ করে হারব। কখনো আত্মসমর্পণ করব না।

ভারতের গভর্নর জেনারেল রাজগোপালচারীর কাছে নিজাম অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তিনি তার ক্ষমতা ব্যবহার করে চেষ্টা করে দেখেন ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে কিছু করা যায় কি না। তিনি কথা দিয়েছিলেন, সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। নিজাম রাজাজীর কাছে অনুরোধ করেছিলেন শান্তি বজায় রাখার জন্য পদক্ষেপ নিতে। রাজাজীর কাছ থেকে যে উত্তর এলো তা হলো এমন—নিজাম আমন্ত্রণ জানাবে ভারতকে, যেন রাজধানীতে তারা তাদের সেনাবহর স্থাপন করে এবং ভারত সরকারের সব প্রস্তাব মেনে নেয়।

এমনি সময় পূর্ব সীমান্তে একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। ঠিক যেমন পশ্চিম সীমান্তে হায়দারাবাদের সীমানার ভেতরে ভারতের কিছু বড়ো ছিটমহল ছিল, তেমনি পূর্ব সীমান্তে ভারতের সীমানার ভেতরে হায়দারাবাদের কিছু ছিটমহল ছিল। যদিও প্রকৃত অর্থে বলা যায়, ওইসব অঞ্চল ভারতেরই দখলে ছিল। কারণ, ভারত হায়দারাবাদের কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে ভারতীয় অঞ্চল পার হয়ে হায়দারাবাদে ওসব ছিটমহলে ঢুকতে দিত না। যদিও হায়দারাবাদ নানাভাবে এর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু সেসব কোনো কাজেই আসেনি। শুধু প্রতিবাদ করা ছাড়া হায়দারাবাদের আর কিছু করার ছিল না। একটি দুঃখজনক ঘটনার পর থেকে কোনো ধরনের প্রতিশোধমূলক কাজ ছিল সম্পূর্ণ নিষেধ। এটি ঘটেছিল নানেজে, পশ্চিম সীমানায়। পশ্চিমে কোদাদ গ্রামে আর্মির একটি ছোটো দল পাঠানো হয়েছিল, এটি ছিল সীমানার ভেতরেরই একটি অঞ্চল।

https://nagorikpathagar.org

অঞ্চলটিকে ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই দলটিকে পাঠানো হয়। এক সকালে ট্যাংক বহর নিয়ে হঠাৎ ভারত সেখানে হামলা চালায়, পুরো গ্রামটিই অল্প সময়ের মধ্যে জ্বালিয়ে দেয় তারা।

হায়দারাবাদের যে সেনাদল সেখানে ছিল, তারা কোনো ধরনের হামলা না চালালেও তাদের ওপর গুলি চালায় ভারতীয়রা। এতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। এসব ছাড়া আর্মি হেডকোয়ার্টারে যেসব বেতার সংবাদ পৌছায় তাতে ধরে নেওয়া হচ্ছিল যে, ভারত সম্ভবত তাদের আগ্রাসনের প্রধান আক্রমণটা শুরু করে দিয়েছে। ভারতীয় সেই বাহিনীই পরে হায়দারাবাদের সীমানা পার হয়ে হায়দারাবাদের ভেতরে ভারতের ছিটমহল মুনিগালা জমিদারিতে এসে অবস্থান করে, যা ছিল হায়দারাবাদের সীমানার ৫০ মাইল ভেতরে। যদিও হায়দারাবাদের সীমানার ভেতরে ভারতীয় বাহিনী ঢুকে পড়েছিল, হায়দারাবাদের কিছুই করার ছিল না। হায়দারাবাদের ছোটো সেনাদলটি তেমনভাবে অস্ত্রসজ্জিত ছিল না, তা সত্ত্বেও তাদের অপ্রস্তুত অবস্থা এবং অজ্ঞাত থাকাটা ছিল আশ্চর্যের বিষয়। তা ছাড়াও আরও বড়ো সমস্যা ছিল এই যে, একটি ভারতীয় ট্যাংক বহর তখন রাজধানীর ৫০ মাইলের মধ্যে অবস্থান করছিল। অথচ সেনাপ্রধানের মধ্যে এজন্য কোনো উদ্বেগই লক্ষ করা গেল না।

নিজাম দ্রুতই একটি মিটিংয়ের আয়োজন করলেন। মিটিংয়ে সবাই সেনাবাহিনীর অপরিপক্বতার জন্য হতাশা ব্যক্ত করেছিল। আমি ঘটনাটিতে অবাক হয়েছিলাম। সেনাপ্রধানকে সতর্ক করে দেওয়া হয় এবং ভারতীয় আক্রমণ ঠেকাতে প্রস্তুত থাকতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়। বিষয়টির গুরুত্ব ব্যক্ত করতে গিয়ে আমি নিজামকে অনুরোধ করি, যেন যেকোনো মুহূর্তে সেনাবহর পরিচালনা করতে পারার মতো আমাকে একটি লিখিত আদেশ দেন। বিকালের মধ্যে তা দেওয়াও হয়। যদিও ততক্ষণে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, ভারতীয় আক্রমণ ২০ তারিখেই হবে।

সব সময়ের মতোই খুব গভীর রাতে আমি ঘুমাতে যাই। আমি প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, কিন্তু টেলিফোনের শব্দ আমাকে জাগিয়ে তোলে। এত রাতে শুধু মন্ত্রীরা, পুলিশ এবং সেনাবাহিনী প্রধান ছাড়া আমার সঙ্গে যোগাযোগের সামর্থ্য কারও নেই। আমি বুঝতে পারলাম, ফোনটা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি ফোন ধরলাম এবং অপর প্রান্তে পুলিশ প্রধান ছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন যে, কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি খুবই অবাক ও বিস্মিত হই; কিন্তু নিজেকে আবার নিয়ন্ত্রণে আনি। আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমি কি ঘুমের মধ্যেই ছিলাম না সজাগ ছিলাম। আবার পর মুহূর্তেই বুঝতে

https://nagorikpathagar.org

পেরেছিলাম সবই সত্য, নির্মম সত্য আমাকে জানানো হলো, সংবাদটি করাচি থেকে নিশ্চিতভাবেই সংগ্রহ করা হয়েছে।

সংবাদটি নিজামের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। আমি শত ক্লান্ত থাকলেও এক ঘণ্টা চেষ্টা করে ঘুমাতে না পেরে উঠে গেলাম। আমি কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে তার আত্মার জন্য শান্তি কামনা করে দুআ করলাম এবং দিনের জন্য প্রস্তুত হলাম। আমি নিজামকে অন্যান্য সময়ের চেয়ে আগেই কল দিলাম এবং ঠিক করা হলো যে মক্কা মসজিদে জনগণকে নিয়ে শোক পালন করা হবে। দিনটিতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। তারপর আমরা এ অবস্থায় কী করা হবে, তা নিয়ে আলোচনায় বসলাম।

আমি নিজামকে বলেছিলাম, জিন্নাহর মৃত্যুর ফলে এখন যেকোনো মুহূর্তেই ভারতের আক্রমণ আশঙ্কা করা যেতে পারে। নিজাম আমার সঙ্গে একমত হলেন না। বললেন, ভারত চাইবে না, বিশ্বের কাছে তাদের বর্বর রূপ তুলে ধরতে। তারপরও আমরা একমত হলাম যে, পাকিস্তান এখন আর কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে না। পরে আমি সেনা হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করে তাদের প্রস্তুতির খবর নিলাম। আমাদের সেনাবাহিনীটি ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই ছোটো। পদাতিক সৈন্যবাহিনীর ব্যাটালিয়ন ছিল দশের কম। এটা ছাড়াও আরও কিছু বাহিনী আমাদের ছিল, কিন্তু তাদের ছিল শুধুই আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য। যদিও দশটির মতো ব্যাটালিয়ন ছিল, কিন্তু তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদি ছিল খুবই সামান্য। অস্ত্র বলতে ছিল শুধু ৩০৩ রাইফেল ও স্টেনগান, প্রতিটি ইউনিটে কিছুসংখ্যক ব্রেন গান এবং কিছু দুই ইঞ্চি ও তিন ইঞ্চি মর্টার। ট্যাংকবিধ্বংসী মাইনের পরিমাণ ছিল খুবই কম। আর যাও ছিল তা সেসব স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে ভারতের ট্যাংক বাহিনীর হানা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ইউনিটগুলোর সবচেয়ে বড়ো অভাব যেটা ছিল, তা হলো ফিল্ড গানের অভাব। যদিও অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল কিছু ওর্লিকন গানের ব্যবস্থা করার, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

সৈন্যবাহিনীর অবস্থান এবং মূল ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে। একটি বাহিনী অবস্থান করছিল পূর্বের সীমান্ত এলাকায়, একটির অবস্থান ছিল উত্তর-পূর্ব সীমানায়, একটি ছিল পূর্বে এবং আরও একটি বাহিনী অবস্থান করছিল দক্ষিণ-পশ্চিমে। একটি বাহিনী বিদার-এ অবস্থান করানো হয়েছিল; যাতে করে পূর্বে, উত্তর-পূর্বে কিংবা উত্তরে কোনো দরকার পড়লে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু বাহিনীটি তখনও সেখানে অবস্থান নেয়নি; বরং পরবর্তী সময়ে এটিকে সেখানে পাঠানোর কথা ছিল। একইভাবে নাকরাকল অঞ্চলেও একটি বাহিনীর অবস্থান ছিল, যাতে করে পশ্চিম বা দক্ষিণ-পশ্চিমে

https://nagorikpathagar.org

কোনো সাহায্যের দরকার পড়লে তাদের সেখানে পাঠানো যায়। ঠিক একইভাবে অন্যান্য ময়দানেও কিছু ছোটো ছোটো দল ঠিক করে রাখা হয়েছিল, যাদের মধ্যে অনেক স্বেচ্ছাকর্মীও যোগ দিয়েছিল। হেডকোয়ার্টারেও একটি ছোটো বাহিনীর অবস্থান ছিল। দেশটির ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ থেকে আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

ভারত পরিকল্পনা করছিল একাধিক অঞ্চল থেকে একই সঙ্গে হামলা চালানোর। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল রাজধানী দখল করা। আমি সেনাবাহিনী প্রধানকে উৎফুল্ল দেখেছিলাম, যা ওই সময়ে আমি আশা করিনি। আমি তাকে বলেছিলাম, জিন্নাহর মৃত্যুর কারণে ভারত তাদের আক্রমণ এগিয়ে আনতে পারে। যেকোনো মুহূর্তে ভারত আক্রমণ শুরু করতে পারে। নিজামের মতোই সেও আমার সঙ্গে একমত হলো না। কিন্তু আমাকে নিশ্চয়তা প্রদান করল যে, তার বাহিনী সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। আমি তবুও অনেক অস্থির ছিলাম, আমাদের ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্রের অভাবের কথা জেনে আমি শান্তিতে থাকতে পারছিলাম না।

মক্কা মসজিদে পূর্বঘোষণা অনুযায়ী শোক পালন অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়েছিল। অনেক লোক এসেছিল তখন। পরে আমি মুন্সীর সঙ্গে পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক দেখা করলাম। তার মধ্যে অনেক ছলচাতুরী লক্ষ করলাম। মুন্সীকে মনের কথা প্রকাশের জন্য ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। মুন্সীর কথা থেকে আমাকে বুঝে নিতে হচ্ছিল যে, সেখানে কতটা সত্য ছিল এবং কতটা সে তার কল্পনা থেকে বলছিল। সত্যবাদিতা তার চরিত্রের অংশ ছিল না। কিন্তু ততদিনে আমি বুঝতে পারতাম, কোনটা সে সত্য বলছে আর কোনটা বানোয়াট। তার সঙ্গে আমার আলোচনা এক বিষয় থেকে শুরু করে অন্য বিষয়ে চলে যাচ্ছিল।

মুন্সী আমাকে তখন বলেছিল, ভারতের আক্রমণ খুব শিগ্‌গিরই আশা করা যায়। আমি তখন তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, যদি তা-ই হয় তবে সে যেন যুদ্ধ শুরুর আগেই হায়দারাবাদ ছেড়ে চলে যায়। কিছু মুহূর্তের জন্য সে হতবাক হয়ে গিয়েছিল এবং বুঝতে পারছিল না যে সে কী বলবে। সে যখন হুঁশে এসেছিল, তখন বলল, এটার সম্ভাবনা খুবই কম যে, ভারত সরকার তাকে সেই অনুমতি প্রদান করবে। সে আমাকে এটাও মনে করিয়ে দেয়, হায়দারাবাদের একজন প্রতিনিধি জেনারেল ভারতে রয়েছে। আমি তাকে বলেছিলাম, ভারত যেমন আচরণ করবে, আমরাও তেমনই আচরণ করব। আমি তাকে আবারও বললাম, তবুও সবচেয়ে ভালো হয় যদি মুন্সী ভারতে ফিরে যায়। যদি যুদ্ধ শুরু হয়, তবে উপযুক্ত ভালো স্থানে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে; কিন্তু তাকে এবং তার কর্মচারীদের বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হবে না। তাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, সে খুব অস্বচ্ছন্দ অনুভব করছে।

https://nagorikpathagar.org

সে আমাকে বলল, তাকে মুক্ত অবস্থায় রাখলেই সে হয়তো-বা কিছু সাহায্য করতে পারবে। আমি জবাবে তাকে কিছুই বললাম না।

মুন্সী আমাকে বলল, ভারত আগে যে সময় নির্ধারণ করেছিল, তার আগেই আক্রমণ চালাতে পারে। ব্রিটিশদের যেভাবে দেওয়া হয়েছিল, সেভাবে হায়দারাবাদ যদি নিজ রাজধানীতে ভারতকে সেনাবহর রাখার ব্যবস্থা করে না দেয়, তাহলে ভারত আক্রমণ চালাবেই। সে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল যে, হায়দারাবাদে ভারতের সেনাবাহিনী প্রবেশ করলেও সবাই নিজ নিজ অবস্থানে বহাল থাকতে পারবে। ফলে সবাই খুশি থাকবে। কোনো সমস্যাই সেখানে হবে না। মুন্সীর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ হয়েছিল—যুদ্ধ শুরু হলে তার কী হবে, কে কী করবে এসব নিয়েও। তার কথায় বোঝা গিয়েছিল, আক্রমণের সময় ঘনিয়ে আসছে। মুন্সী অনেক রাত পর্যন্ত ছিল এবং সে চলে যাওয়ার পর নিজামকে জানানো সম্ভব ছিল না এসব বিষয় সম্পর্কে। কিন্তু আমি সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি তাকে বলি, হয়তো-বা সকালেই ভারত আক্রমণ শুরু করবে। তিনি আমার কথায় অবাক হয়েছিলেন। কারণ, তার কাছে যে রিপোর্ট ছিল তা অনুযায়ী ২০ তারিখের আগে আক্রমণ চালানো শুরু হবে না।

আমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমাতে গিয়েছিলাম এবং পরদিন দেরিতে ঘুম ভাঙে। আমি জানতে চাইলাম, আমার জন্য কোনো ফোনকল এসেছিল কি না এবং জানলাম যে, কোনো কল আসেনি। যদি ভারত আক্রমণ করত, তবে ততক্ষণে আমি জেনে যেতাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম, হয়তো-বা সেনাপ্রধানের রিপোর্টটিই সঠিক ছিল, ২০ তারিখের আগে ভারত হামলা করবে না। প্রতিদিনের মতোই আমি নিজামের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভারত আক্রমণ করলে কী হবে, কত দিন তাদের আটকে রাখা যাবে, সেনা কমান্ডার কী মনে করেন—এসব নিয়ে আমরা আলাপ করেছিলাম। আমি নিজামকে বলেছিলাম, যেটা আমাকে সবচেয়ে চিন্তিত করছে সেটা হলো সেনাবাহিনী প্রধানের নিশ্চয়তা দেখে। আমার মনে হচ্ছে, সে পরিস্থিতির গুরুত্ব আন্দাজ করতে পারছে না। অথবা অন্য কিছু। আমি নিজামের সঙ্গে তার বিভিন্ন দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং নিজাম আমার সঙ্গে একমত হলেন। বললেন, আমি যেন সেনাপ্রধানের পদ অন্য কাউকে প্রদান করি, যা তখন একটি কঠিন কাজ ছিল। তা ছাড়া বিষয়টি অনেক দেরিতে আমাদের বোধগম্য হওয়ার কারণে সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।

অনেক আলাপ-আলোচনা করে পরে দেখা গেল, কারও পদ পরিবর্তন করলে নানা সমস্যা হতে পারে। ফলে সব যেমন সময় ছিল, তেমনি থাকতে দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা দুআ করছিলাম, যেন সব ভালোয় ভালোয় হয়।

https://nagorikpathagar.org

অবশেষে এলো সেই অভিশপ্ত দিন। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ ভোরবেলা ভারত গোটা পৃথিবীর তাবৎ বাদ-প্রতিবাদকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল হায়দারাবাদের ওপর। আসলে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই ভারত হায়দারাবাদে সেনা অভিযানের বিষয়টি চূড়ান্ত করে রেখেছিল। অপেক্ষা করছিল উপযুক্ত সময়ের। ১১ সেপ্টেম্বর জিন্নাহর মৃত্যু তাদের সেই সুযোগটি এনে দেয়। জিন্নাহর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মাঝখানে এক দিন বাদ দিয়ে শুরু করে আক্রমণ। ভারত ধারণা করেছিল, সমগ্র পাকিস্তান এখন শোকে মুহ্যমান। এই সময় হায়দারাবাদ আক্রমণ করলে পাকিস্তানের তরফ থেকে কোনো বাধা হয়তো আসবে না। ভারতের এই অনুমান যে সঠিক ছিল, তা আক্রমণ শুরুর পরই বোঝা গেল। পাকিস্তান সেদিন হায়দারাবাদের পাশে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, কোনো পদক্ষেপই নিতে পারেনি।

এ ছাড়া এই সর্বগ্রাসী আক্রমণ শুরুর আগেই ভারত হায়দারাবাদের কিছু রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীর মতো সেনাপ্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আল ইদরুসকে কিনে ফেলেছিল। বাংলার বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের মতোই এই আল ইদরুস নিজাম ও প্রধানমন্ত্রীকে ধোঁকা দিয়ে সেনাবাহিনীর উন্নয়নের গতি রুদ্ধ করে রেখেছিল। সেনাবাহিনীকে ফেলে রেখেছিল প্রায় অপ্রস্তুত অবস্থায়। দেশের গুরুত্বপূর্ণ অনেক সীমান্ত রেখেছিল অরক্ষিত অবস্থায়। নিজাম ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে বারবার ভুল তথ্য দিয়ে তিনি তাদেরও করে ফেলেছিলেন বিভ্রান্ত। যুদ্ধের মানচিত্র, দেশের রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট সম্পর্কেও তাদের রেখেছিলেন অন্ধকারে। ভারতীয়রা সেনাপ্রধানের মাধ্যমেই হায়দারাবাদকে ভেতর থেকে দুর্বল করে তারপর শুরু করল আক্রমণ।

ভারত সারা পৃথিবীকে এখনও বোঝানোর চেষ্টা করে, হায়দারাবাদে কোনো সেনা অভিযান হয়নি। হায়দারাবাদের জনগণকে রক্ষার জন্য, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য নিতান্ত বাধ্য হয়ে নেওয়া হয়েছিল কিছু পুলিশি অ্যাকশন। আদতে তাদের এই কথা ডাহা মিথ্যা। কারণ, সে সময়কার ভারতীয় সেনাবাহিনীর অর্ধেক অংশ হায়দারাবাদ আগ্রাসনে অংশ নিয়েছিল।

https://nagorikpathagar.org

ভারত এই সামরিক অভিযানের নাম দিয়েছিল 'অপারেশন পলো'। আর এই অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল জেনারেল জে এন চৌধুরীকে (জয়ন্ত নাথ চৌধুরী)। তার নেতৃত্বে দেওয়া হয়েছিল একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল, তিনজন মেজর জেনারেলসহ সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীকে।

হায়দারাবাদের অভিযানের নীলনকশা প্রণয়ন করেন জেনারেল ই. এন গোরদাদ। তিনি ছিলেন সাউদার্ন কমান্ডের জিএসও। হায়দারাবাদ অভিযানে ভারত ব্যবহার করে—

- ১টি আর্মার্ড ব্রিগেড
- ৭ ডোগরা রেজিমেন্টের থার্ড ক্যাভালরি
- নবম ব্যাটালিয়ন
- ৩টি ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়ন
- অতিরিক্ত আরও ৩টি ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়ন
- ৩ রেজিমেন্ট ফিল্ড আর্টিলারি
- ১টি অ্যান্টি ট্যাংক রেজিমেন্ট
- ১৮ ক্যাভালরি
- সার্ভিস মেইনটেন্যান্স ট্রুপস
- বিপুলসংখ্যক 'ফোরম্যান' ও 'স্টুয়ার্ট' ট্যাংক
- রয়্যাল ইন্ডিয়ান বিমানবাহিনী

ভারতের বিশাল সামরিক আগ্রাসনের বিপরীতে হায়দারাবাদের ছিল—

- সেনা সদস্য ২২ হাজার
- ৮টি ২৫ পাউন্ডের কামান
- ৩ রেজিমেন্ট সেনা যানবাহন
- ১০ হাজার পুলিশ ও কাস্টমস বাহিনী
- কাশেম রিজভীর বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবক রাজাকার, যাদের অস্ত্র বলতে ছিল লাঠি ও কিছু বর্শা।

অর্থাৎ, একটি প্রায় অস্ত্রবলহীন দেশের বিরুদ্ধে ভারত তার বিপুল সেনাশক্তি, পদাতিক বাহিনী, ট্যাংক ও বিমানবাহিনীর সহায়তায় পরিচালনা করে ভয়াবহ সাঁড়াশি আক্রমণ। হায়দারাবাদকে বাধ্য করে আত্মসমর্পণে। তারপর চুক্তি-যুক্তি

https://nagorikpathagar.org

সব পায়ের তলায় মাড়িয়ে জারি করে সেনাশাসন। আর জাতিসংঘ সেই ঘোর সংকটকালে হায়দারাবাদের পাশে না দাঁড়িয়ে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিল ভারতকে, যাতে তারা দেশটিকে পুরোপুরি দখলে নিতে পারে। এজন্যই নিরাপত্তা পরিষদে হায়দারাবাদসংক্রান্ত যে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল ১৬ সেপ্টেম্বর, তা চার দিন পিছিয়ে ২০ তারিখে নির্ধারণ করা হয়েছিল। কারণ, জেনারেল আল ইদরুস ভারতকে আট সপ্তাহ আটকে রাখার নামে যে ধারণা দিয়েছিল, তা যে ১৮ সেপ্টেম্বরের সম্পন্ন হবে, সেটা নিজাম বা মীর নায়েক আলি না জানলেও জানত ভারত। হয়তো ভারতের কারণেই ২০ তারিখে অধিবেশন ডাকে নিরাপত্তা পরিষদ। এ অধিবেশন বসার দুদিন আগেই কেল্লা ফতে করে ফেলবে ভারত। তখন ২০ তারিখে কোনো আলোচনারই আর দরকার হবে না।

এবার ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতের আক্রমণ শুরুর পর থেকে বাকি ধারাবিবরণ লায়েক আলির জবানি থেকে শুনে নেওয়া যাক—

সময়টি ছিল ১৩ সেপ্টেম্বরের সকাল। বিছানার পাশে রাখা ফোনের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। টেলিফোন রিসিভ করার আগেই আমার মনে হচ্ছিল, ভারতের আক্রমণের বিষয় জানানোর জন্যই হয়তো-বা এটা বাজছে। আমার সন্দেহ সত্যি হয়েছিল। এটি ছিল আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে সরাসরি ফোনকল। সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন লাইনে। তিনি আমাকে বলছিলেন—শেষ ১৫ মিনিটের মধ্যে তার কাছে চারটি তথ্য এসেছে যে, ভারত বিশাল সৈন্য নিয়ে তাদের আক্রমণ শুরু করেছে। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি আমাকে আরও কিছু তথ্য দিলেন—বিদর, আওরঙ্গবাদ ও ওয়ারাখালে ভারতীয় বিমানবাহিনী বিপুল পরিমাণে বোমা ফেলছে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, তার কী করা উচিত। আমি তাকে বললাম—'আপনার কী ধারণা, আমি আপনাকে কী বলব?' এবং আরও সংযুক্ত করলাম—'এখনই সৈন্যদের বলুন ভারতের আক্রমণ ঠেকাতে।' তিনি আমার কথায় সায় দিয়ে ফোন রেখে দিয়েছিলেন। আমি তাকে আবারও কল দিলাম এবং জানালাম, সব ঘটনার আপডেট যেন আমাকে একটু পরপর দেওয়া হয়। আমাকে জানালেন যে, তিনি তার অফিসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সেখান থেকেই সব পরিচালনা করবেন। আমি তাকে সাধুবাদ জানিয়ে সৌভাগ্য কামনা করেছিলাম।

এটা ছিল আমার ঘুম থেকে ওঠার সাধারণ সময়ের চাইতে আধঘণ্টা আগে। এরপর আমি ফজরের নামাজ পড়ে সারাদিনের জন্য প্রস্তুত হলাম। কিছু মিটিংয়ে অংশ নিলাম। পুলিশপ্রধানের সঙ্গে জরুরি আলাপ সেরেছিলাম। আরও কিছু আলাপ হয়েছিল আর্মি হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে। আরও কিছু এলাকায় ভারতীয়

https://nagorikpathagar.org

বিমানবাহিনী নির্বিচারে বোমা নিক্ষেপ করেছিল। নিজামের কাছে যাওয়ার আগে আরও একবার আর্মি হেডকোয়ার্টারে কল দিয়েছিলাম।

আর্মি চিফ খুব ব্যস্ত ছিলেন। তখন জানা গেল যে, তাদের প্রধান আক্রমণ স্থান হলো পূর্ব দিক থেকে সোলাপুর-হায়দারাবাদ রাস্তা দিয়ে এবং পশ্চিমে মাসুলিপাতাম-হায়দারাবাদ রাস্তা ধরে। শেরমান ট্যাংক নিয়ে ভারতীয় আর্মি এই এলাকা দিয়ে এগিয়ে আসছিল। এ ছাড়াও উত্তর-পূর্ব এলাকাগুলোতে হামলায় ব্যবহৃত হচ্ছিল হালকা ট্যাংক, বর্মবিশিষ্ট গাড়িসহ আরও বিভিন্ন অস্ত্র। উত্তরে ভারতীয় সেনারা প্রবেশ করছিল রেলপথে। রেলে তারা ওয়ার্দা নদী পাড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছিল। পশ্চিমে তাদের মূল ধাক্কার পাশাপাশি বর্ডারের বিভিন্ন স্থান চিরে ভারতীয় সেনারা এগিয়ে আসছিল। পূর্ব থেকে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে আসার রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল, সেদিকে পাঁচটি স্থান থেকে ভারতীয় সেনারা এগিয়ে আসছিল। এ ছাড়াও জানা গেল, তুঙ্গভদ্রা নদী পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছে কিছু ভারতীয় সেনা। তারা নদী পাড়ি দেওয়ার জন্য রেলপথের সেতু ব্যবহার করছে। আর্মি চিফ মানচিত্রের যেসব স্থান দিয়ে ভারত আক্রমণ করছে, সেসব স্থান চিহ্নিত করার জন্য ডট বসাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, পুরো মানচিত্র ডট বসাতে বসাতে ভরে গেছে।

সোলপুরে ভারত আগে থেকেই শক্তি সঞ্চয় করছিল, যাতে তাদের মূল আক্রমণ স্থানকে তারা আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে। বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই ভারত সেখানে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। আশপাশের এলাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সাধারণ জনগণ সেখানে চলাফেরা করতে না পারে। সেখান থেকে রাজধানী আক্রমণের জন্য ভারতের দুটি বিকল্প রাস্তা ছিল। হায়দারাবাদ রক্ষাকারী বাহিনীর চেয়েও ভারতের কঠিন শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল হায়দারাবাদের ভূপ্রকৃতি।

পূর্ব থেকে ভারত কোন পথে আক্রমণ করবে, তা আগে থেকেই অনুমান করে সেখানে বসানো হয়েছিল প্রথম প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। এলাকাটি ছিল নলদ্রাগ গিরিপথ। সেই গিরিপথে ২৫ পাউন্ডার ফিল্ড গান বসানো হয়েছিল, যাতে শত্রু সেখান দিয়ে এগোতে না পারে। সেখানে একটি সেতু ছিল, পরিকল্পনা ছিল সেই সেতুটি উড়িয়ে দেওয়া হবে। সেতু দিয়ে আসতে না পারলে শত্রুকে অনেক দূর ঘুরে আসতে হবে। নয়তো-বা সেই স্থান পার করা সম্ভব হতো না। কারণ, সেখানকার ভূপ্রকৃতিই এমন ছিল। গিরিপথ পেরিয়ে যে এলাকাটা পড়ে তা হলো ওসমানাবাদের হেডকোয়ার্টার, যা তখন অপরাজিত ছিল। দ্বিতীয় প্রতিরোধব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল মানজেরা নদীর তীরে। সেটা ছিল

https://nagorikpathagar.org

এবড়ো-খেবড়ো এবং উঁচুনিচু। এখানে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল, যাতে করে বিদর যাওয়ার পথে শত্রুদের থামানো যায়।

নলদ্রাগের পেছনে সোলাপুর-হায়দারাবাদ রাস্তার ধার দিয়ে প্রতিরোধব্যবস্থা গড়া হয়েছিল। নলদ্রাগ থেকে ৪০ মাইল দূরে ছিল দালাম। যদিও প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ার জন্য জায়গাটা খুব ভালো ছিল না, এখানে প্রতিরোধ গড়ে এগিয়ে আসা শত্রুদের কিছু সময় আটকানো সম্ভব ছিল। দালামের পর ছিল হুমনাবাদ, যা রাজধানী থেকে ১০০ মাইল দূরে। প্রতিরোধ গড়ার দিক থেকে এটি নলদ্রাগের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এলাকাটা ছিল পাহাড়ি এবং সেখানে একটু পরপর অনেকগুলো স্থান ছিল, যেখানে শত্রুকে থামানো সম্ভব ছিল। এরপর কিছুদূর এগিয়ে গেলে ভূপ্রকৃতিনির্ভর প্রতিরোধব্যবস্থা আর তেমন নেই। সেখান থেকে রাজধানী পর্যন্ত রাস্তা প্রায় পরিষ্কার। লিঙ্গামপালিতে শুধু কিছু স্বল্প এলাকা বিস্তৃত পাহাড়ি অঞ্চল ছিল। এসব ছিল রাজধানী থেকে মাত্র ১০ মাইলের দূরত্বে।

১৩ তারিখ দিনের বেলা ট্যাংক বাহিনী আক্রমণ শুরু করে। তাদের মধ্যে ছোটো একটা অংশ ওসমানাবাদের দিকে চলে যায়। কিন্তু তাদের মূল শক্তি পশ্চিমে এগিয়ে যায় নলদ্রাগের দিকে। স্থলের বাহিনীকে সহায়তা করে ভারতীয় বিমানবাহিনী। তারা অনবরত বোমা ফেলেই যেতে থাকে। নলদ্রাগে অবস্থিত আমাদের সৈন্যদের ওপর তারা আক্রমণ চালায়। ট্যাংক বহর সাবধানতার সঙ্গে এগিয়ে যায় এবং সেখানে অবস্থিত হায়দারাবাদ সুরক্ষা বাহিনীর ফিল্ড গানের একেবারে সামনাসামনি চলে আসে। অভ্রান্ততার সঙ্গে ফিল্ড গান উড়িয়ে দেয় ছয়টি (অন্য একটি রিপোর্ট অনুযায়ী আটটি) ভারতীয় শেরমান ট্যাংক। এর ফলে সামনের কলামের ট্যাংক বহরের মধ্যে ধাঁধার সৃষ্টি হয় এবং তারা যেখান থেকে আসা শুরু করেছিল, সেদিকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

উত্তরের দিকে তাদের যে ইউনিটটি এগিয়ে যাচ্ছিল, তারা কোনো বাধা ছাড়াই এগোতে থাকে। তারা অনবরত বোমা ফেলার পর ওসমানাবাদে প্রবেশ করে। এরপর তারা উত্তরেই এগোতে থাকে ইয়েদমির দিকে। তাদের মূল লক্ষ্য লাটুরে প্রবেশ করা। যদিও কোনো বাধা ছাড়াই তারা এগিয়ে যাচ্ছিল তারা এগোচ্ছিল খুব সীমিত পর্যায়ে।

পশ্চিম থেকে আক্রমণ শুরু করে আরেকটি ভারতীয় ট্যাংক বহর, যারা হায়দারাবাদ পরিবেষ্টিত ভারতের মঙ্গলা অঞ্চলে আগেই অবস্থান করছিল। তারা সুরিয়াপেত নামক এলাকার দিকে এগোতে থাকে। তারা কোন দিক দিয়ে গিয়ে সুরিয়াপেত হয়ে রাজধানীর দিকে এগোবে, তা তখনও বলা যাচ্ছিল না। তাদের থামানোর জন্য যে বাহিনীটা ছিল, তারা অবস্থান করছিল মুসি নদীর পশ্চিম তীরে।

https://nagorikpathagar.org

তাদের ছিল না কোনো ফিল্ড গান, কেবল মর্টার দ্বারা সজ্জিত ছিল। তারা মোটেও শক্তিশালী ছিল না। ধারণা করা হচ্ছিল ভারতীয় বাহিনী তাদের পার করে রাজধানী যাওয়ার জন্য চারটি রাস্তার একটি বেছে নেবে। কিন্তু রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল, ভারতীয় সেনারা সোজা সুরিয়াপেতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেখানে নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল তুলনামূলকভাবে কিছুটা শক্তিশালী।

পশ্চিম সীমান্ত থেকে আসা অন্য খবরগুলো তেমন ভীতিকর ছিল না। ছোটো ছোটো কিছু ভারতীয় বাহিনী হালকা স্টুয়ার্ট ট্যাংক নিয়ে সেদিক থেকে আক্রমণ চালাচ্ছিল। কিন্তু তারা আমাদের তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। সবচেয়ে ত্রাস সৃষ্টিকারী খবর ছিল যে, ওয়ারদ্ধা নদীর ওপর দিয়ে যে রেলপথ সেতু, তা ধ্বংসের জন্য যেসব সৈন্য এবং ইঞ্জিনিয়ার পাঠানো হয়েছে, তারা ব্রিজটি ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ভারতীয় বাহিনী ব্রিজটি পাড়ি দিয়ে ব্রিজটির সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। ভারতীয় বাহিনী যাতে আরও এগোতে না পারে সেই লক্ষ্যে ওই স্থানে আরও যেসব ছোটো ছোটো সেতু ছিল তা ঠিকই ধ্বংস করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে আর তেমন কোনো লাভ হয়নি।

উত্তর ও উত্তর-পূর্ব থেকে যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছিল, তা ছিল খুব আবছা এবং বিভ্রান্তিকর। জালনা এলাকা থেকেও বিভ্রান্তিকর খবর পাওয়া যাচ্ছিল। আওরঙ্গবাদ সীমানা থেকে কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছিল না। পূর্ব সীমানায় বীর জেলায় তেমন কোনো প্রতিরক্ষাবাহিনী ছিল না। কিন্তু খবরে জানা গেল তেমন কোনো আক্রমণ সেদিক থেকে আসছে না। অন্যদিকে রিপোর্ট পাওয়া গেল যে, হুবলি-মোনিরাবাদ রেলপথে ভারতীয় সেনাদের তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সেখানে আমাদের তেমন কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল না। স্বেচ্ছাসেবকসহ কিছু ইঞ্জিনিয়ারদল সেখানে অবস্থান করছিল। তারা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

ভারতীয় একটি বাহিনীকে তারা প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছিল। তারা সেখানে খুব ভালো ফল এনে দিচ্ছিল। সবচেয়ে ভয়াবহ খবর পাওয়া যাচ্ছিল দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দর থেকে। ভারতীয় বিমানবাহিনী ওয়ারাঙ্গাল, বিদর, রিচুর, আদিলাবাদ, আওরঙ্গবাদ বিমানবন্দরে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে সেগুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। সেখানে এত পরিমাণে বোমাবর্ষণ হচ্ছিল যে, পাঁচটির মধ্যে মাত্র একটি বোমা রানওয়ের ওপর পতিত হচ্ছিল। কেবল হাকিমপেত বিমান ঘাঁটিতেই আমাদের কিছু বিমানবিধ্বংসী সরঞ্জাম ছিল এবং সম্ভবত ভারতীয় বিমানবাহিনীকে তা আগেই জানানো হয়েছিল। দেখা গেল, সেই এলাকার আশপাশে দিয়েও তারা যায়নি।

https://nagorikpathagar.org

আর্মি হেডকোয়ার্টারে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমি নিজামকে ফোন দিই। আমরা কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিকতাকে বর্জন করে কথা বলি। এখন কী করা হবে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী—এসব বিষয়ে আমরা আলাপ করি। আর্মি কমান্ডারকে নিজাম ডেকে পাঠান এবং যুদ্ধে কী হচ্ছে তা বিস্তারিত জানতে থাকেন। আমি নিজামকে মনে করিয়ে দিই যে, বর্তমান অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কারণ, হেডকোয়ার্টারে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। কিছুক্ষণ পর আমিও ক্ষমাপ্রার্থনা করে সেখান থেকে কাজে চলে যাই। কথা দিই তাকে ফোনে একটু পরপর সব খবর জানানোর।

জেনারেল স্টাফের অফিসারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, বেতার মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য আমরা যে গোপন কোড ব্যবহার করছি, তা সম্ভবত ভারতকে জানিয়ে দিয়েছে কেউ। তা ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে থাকার সম্ভাবনাও অনেক বেশি। যতই আমি তাদের সঙ্গে কথা বললাম, ততই হতভম্ব হলাম। আমাদের সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি এতই খারাপ জেনে আমি স্তম্ভিত হলাম। এ রকম অবস্থায় এই আর্মি চিফ কী করে এতটা উৎফুল্ল থাকছে ভেবে আমি রীতিমতো অস্থির হয়ে পড়লাম। আর্মি চিফের নানা ভুলত্রুটির কথা জেনে আমার অবাক লাগছিল। এত বিচক্ষণ স্টাফ থাকতেও তার প্রস্তুতি কীভাবে এত খারাপ ছিল, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। পথপ্রদর্শনের জন্য কমান্ডার একটু পরপর আমার পরামর্শ নিচ্ছিলেন।

আমি বুঝতে পারলাম, আর্মি চিফের ওপর আস্থা রাখা আমাদের উচিত হয়নি। কিন্তু সময় এমন ছিল না যে, কাউকে দোষারোপ করা যাবে। নিজামকে সব জানানোর পর তিনি খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। ব্যবস্থা এমন নেওয়া হলো যে, সব কমান্ড পাস করানোর জন্য আগে আমাকে দেখানো হবে এবং আমার অনুমতি পেয়েই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আর্মি চিফের সব আত্মবিশ্বাস কোথায় যেন গায়েব হয়ে গিয়েছিল। আমি তার মধ্যে আশা জাগানোর চেষ্টা করলাম এবং বললাম সাহস না হারাতে। এরপর আমি নিজামের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। নিজামের সঙ্গে একটু পরপর দেখা করা এবং তাকে সাহস জোগানো খুবই দরকারি ছিল।

মাহবুব আলি খান নামে একজন সরকারি কর্মচারী আমার সঙ্গে ছিলেন, আমাকে সব কাজে সহায়তা করার জন্য। তিনি ছিলেন অদম্য মানসিক শক্তির অধিকারী এবং ঠান্ডা মাথার মানুষ। তার মাধ্যমে আমি করাচিতে অবস্থিত এজেন্ট জেনারেল আমাদের রাষ্ট্রদূত মুসতাক আহমেদের কাছে এবং জাতিসংঘে অবস্থিত আমাদের প্রতিনিধিদের কাছে তথ্য আদান-প্রদানের কাজ

https://nagorikpathagar.org

করিয়েছিলাম। মাহবুব আলি খানকে আমি ডাইরেক্টর জেনারেল অব কো-অর্ডিনেশন নামে একটি পদ দিয়েছিলাম। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে আগেই আমি তৈরি করে রেখেছিলাম। কেএম মুন্সীকে তার অফিস থেকে সরিয়ে সরকারি গেস্ট হাউসে স্থানান্তরের কাজটি আমি তাকে দিয়েছিলাম। আমাকে জানানো হলো যে, মুন্সীকে যত্নের সঙ্গে গেস্ট হাউসে স্থানান্তর করা হয়েছে। তার গার্ডদের আর্মি ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রেডিও মাধ্যমে এ খবরটি ভালোভাবে প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছিল, যাতে করে দিল্লিতে অবস্থিত হায়দারাবাদের রাষ্ট্রদূত এজেন্ট জেনারেলকেও এমন যত্ন নেওয়া হয়। হেডকোয়ার্টারে ফিরে যা জানলাম, তাতে ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলাম। নলদ্রাগে আমাদের প্রতিরক্ষাবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে। জানতে পারলাম, বাকি সৈন্যদের সেখান থেকে দালামে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে ভারতীয় সেনারা সরে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সেখান থেকে আমাদের সৈন্য কেন অপসারণ করা হয়েছে, সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। উদ্বেগের সঙ্গে জানতে পারলাম, নলদ্রাগ পাহাড়ি এলাকার সেতুটিও এখন পর্যন্ত ধ্বংস করা হয়নি। সৈন্যদের দালামে ফিরিয়ে না এনে তাদের সাহায্যের জন্য আরও সৈন্য সেখানে কেন পাঠানো হলো না? আমাকে জানানো হলো, আকাশ থেকে বোমা ফেলা হচ্ছে বলে সেখানে সৈন্য পাঠানো সম্ভব হয়নি।

আমার আত্মবিশ্বাস কেঁপে উঠেছিল; আমি কঠোর আদেশ দিয়েছিলাম যেন আমাকে না জানিয়ে কোনো সৈন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়ার কোনো বড়ো সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়। আরও জানতে পারলাম, নলদ্রাগ পাহাড়ি এলাকার ব্রিজটি পার হয়ে ভারতীয় সেনারা এগিয়ে আসছে এবং তাদের বিরুদ্ধে একটি গুলি চালানোর লোকও সেখানে নেই। সেনাপ্রধান ব্রিজটি ধ্বংস করতে না দিয়ে আমাদের জন্য মহাবিপর্যয় ডেকে এনেছেন। তা ছাড়া তিনি আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, সেদিনকার মতো ভারতীয় সেনারা আর এগোতে পারবে না। তার মতে, দালাম পৌঁছতে ভারতীয় সেনাদের পরদিন সারাদিন সময় লেগে যাবে। ফলে সেখানকার পাহাড়ি এলাকায় ভালো ধরনের একটি প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে। অথচ সেখানে তখন সংবাদ পাঠানো হয়েছিল, যাতে ভারতীয় সেনারা তাদের কাছে পৌঁছানোর আগে তারা সেখান থেকে পিছু হটে হায়দারাবাদে চলে যায়।

আর্মি চিফ হেডকোয়ার্টারে রইলেন তত্ত্বাবধানের জন্য। জেনারেল স্টাফদের নির্দেশ দেওয়া হলো, তাকে এবং আমাকে সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবর সঙ্গে

https://nagorikpathagar.org

সঙ্গে জানিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি চলে গেলাম সন্ধ্যায় নিজামের সঙ্গে আবারও দেখা করার জন্য। জানতে পারলাম, বিমান থেকে বিভিন্ন বিমানবন্দরে বোমা হামলা ছাড়া তেমন কোনো ঘটনা তখনও ঘটেনি।

নলদ্রাগ ও ওয়ারদা ব্রিজ ধ্বংস করতে ব্যর্থ হওয়ায় আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে, আমাদের সেনাবাহিনী কোনো ধরনের বিধ্বংসী কাজ করার জন্য আর যোগ্য নয়। আমি ভরসা করতে পারতাম শুধুই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের ওপর। যারা ওগুলো নির্মাণ করেছিল। তাদের দায়িত্ব দিয়ে আমি তাদের কাছ থেকে হ্যাঁ-বোধক উত্তর পেয়েছিলাম। যদিও তাদের কাছে গোলাবারুদের অনেক ঘাটতি ছিল। একমাত্র সুপরিকল্পিত এবং সঠিকভাবে কার্যসম্পাদনের মাধ্যমেই তারা ধ্বংসকরণ কাজ পরিচালনা করতে পারত। তাদের মধ্যে আমি যথেষ্ট সাহস ও উৎসাহ লক্ষ করেছিলাম।

https://nagorikpathagar.org

হায়দারাবাদে ভারতীয় আগ্রাসন ও সামরিক অভিযানের দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হলো। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে ভারতীয় সেনারা। বিশেষ করে, মুসলমানদের বেছে বেছে হত্যা করছে তারা। অন্যদিকে প্রতিরোধব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়েছে ভারতীয় তাঁবেদাররা। খোদ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আল ইদরুসের ভূমিকা ছিল বিশুদ্ধ মীর জাফরের। অন্যদিকে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে ভারত তার হায়দারাবাদ অভিযান সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করতে পারে। অন্যদিকে পর্যাপ্ত অস্ত্রের অভাবে তড়পাচ্ছে হায়দারাবাদ। পাকিস্তান থেকে কিছু সাহায্য এলো, সেটাও অনেক পরে। দ্বিতীয় দিনেই হায়দারাবাদের প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলি বুঝে গিয়েছিলেন, সামনে এখন মাত্র দুটি পথ—আত্মসমর্পণ, না হয় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। সেনাবাহিনী প্রধানের মনের মধ্যে যা-ই থাক, লায়েক আলি সিদ্ধান্ত নিলেন যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। যদিও সেনাপ্রধানের কাজকর্মে তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

এই পুরো উদ্বেগাকুল ঘটনাপ্রবাহের সবচেয়ে বড়ো সাক্ষী মীর লায়েক আলি। তার জবানিতেই শোনা যাক ঘটনার ধারাক্রম :

আক্রমণ শুরু হওয়ার দ্বিতীয় দিন। ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮। যুদ্ধের কোনো ময়দান থেকেই তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর এলো না। কিন্তু একটি রিপোর্টে জানা গিয়েছিল যে, জালনা নামক অঞ্চল ভারতীয়দের কাছ থেকে পুনর্দখল করা হয়েছে। আমার এই খবর খুব আশ্চর্য লাগছিল। কারণ, উত্তর-পূর্বের এই এলাকা আদৌ ভারত দখল করেছিল কি না, এমন কোনো খবর আমি আগে পাইনি। সেনাপ্রধানের মতামত ছিল, সেদিন ভারত আর অগ্রসর হবে না। কারণ, তারা বিশ্রাম গ্রহণ করবে। তারা নিজেদের পজিশন সম্পর্কে সচেতন হবে এবং প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের কাজ করবে।

বেলা যতই পার হতে লাগল, সব দিক থেকে ভালো-মন্দ দুই ধরনের খবরই আসতে লাগল। দিনের মধ্যভাগে দিল্লির রেডিওর সংবাদে বলা হচ্ছিল যে,

https://nagorikpathagar.org

তারা যুদ্ধের সব ময়দানেই শত্রুর ভারী আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছে। আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে, এরচেয়ে আশ্চর্য এবং হাস্যকর কথা আমি কোথাও কখনো শুনিনি। বরং তারা এটা বললে সঠিক হতো যে, ভারতীয় সেনারা আশ্চর্য রকমভাবে কম প্রতিরোধ শক্তির মুখোমুখি হচ্ছে। তার আগের দিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ভারতীয় সেনারা তখনই বীরের মতো যুদ্ধ করতে পারে, যখন প্রতিপক্ষ চুপচাপ বসে থাকে। কিন্তু যখন প্রতিপক্ষ গুলি চালায়, তখন তারা হুড়মুড় করে ভেগে পালায়। যুদ্ধের সব ময়দানেই এমনি দৃশ্য লক্ষ করা গিয়েছিল।

তখন লক্ষ করেছিলাম যে, ভারতীয় বাহিনী যেসব স্থানে ট্যাংক ছাড়া আক্রমণ করেছে, সেসব স্থানে তারা আগাতে পারেনি। এমনকি তাদের শক্তিশালী আর্মি যখন কি না আমাদের কিছু স্বল্প প্রশিক্ষিত দুর্বল বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিল, সেখানেও তারা কোনো প্রকারেই অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তারা আমাদের আক্রমণ মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে পিছপা হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্বল কিছু দল কেবল স্বল্প কিছু সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়েই অনেক ক্ষেত্রে ভালোভাবে ভারতকে টেক্কা দিয়েছিল। সাদিক আলি খান নামে একজন সাহসী ইঞ্জিনিয়ার জিপে করে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু ভারতীয় বাহিনী অতর্কিতভাবে তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে। এসব স্বেচ্ছাসেবকের মতে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুতেই তারা হতাশাগ্রস্ত বা পিছপা হয়নি। তারা একমাত্র যা চাচ্ছিল তা হলো, আরও কিছু গোলাবারুদ। তারা সব সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

মূল আক্রমণকারী বাহিনীর একটি অংশ তাদের মূল গন্তব্যপথ থেকে সরে উত্তরের দিকে এগিয়ে যায়। তারা ওসমানাবাদ দখল করে, যা ছিল অরক্ষিত। কেন সেখানে কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল না, তা আমাকে সেনাপ্রধান কখনোই জানাননি। খবর পাওয়া গেল যে, ভারতীয় বাহিনী শহরে প্রবেশ করেছে। প্রবেশের আগে তারা সেখানে ভারী গোলাবারুদ নিক্ষেপ করে। শহরে তেমন কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নেই, এটা জেনেও তারা এমনটি করেছিল! শহর দখল করার পর সাধারণ জনগণের মধ্যে তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। বিশেষভাবে তারা মুসলমানদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের হত্যা করে। নারী-পুরুষ-শিশুনির্বিশেষে তারা হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। দখল শেষে তারা সেখানে সামান্য কিছু বাহিনী রেখে যায় তাদের অপকর্ম সম্পূর্ণ করার জন্য এবং তারা এগিয়ে যায় ইয়াদসির দিকে। আশা করা হচ্ছিল, সেখান থেকে

https://nagorikpathagar.org

তারা লাটুর হয়ে বিদরের দিকে অগ্রসর হবে। কিন্তু পরদিন তাদের অগ্রসর হওয়ার আর খবর পাওয়া যায়নি। বিদরে উঁচু রাস্তায় ছিল ভালো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। আশা করা হচ্ছিল, আমাদের বাহিনী সেখানে শত্রুকে ভালোভাবেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

নলদ্রাগ দখলের পর আশা করা হচ্ছিল যে, তারা লাটুরের দিকে কোনো ভারী হামলা চালাবে না। এ কথা যখন আমি সেনাবাহিনী প্রধানকে বললাম এবং আরও বললাম যে, সেখান থেকে কিছু সৈন্য এবং ফিল্ড গানকে সরিয়ে বিদর প্রতিরক্ষায় অথবা জসিরাবাদের পেছনে পাহাড়ি এলাকার প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার করা হোক, তখন তিনি আমার সঙ্গে একমত হলেন না। তিনি আমাকে বোঝালেন, যদি এমনও হয় যে ভারত বাহিনী বিদরের প্রতিরক্ষা ভেঙে সেখানে প্রবেশ করে, তবে সেখান থেকে রাজধানীতে যাওয়ার অনেকগুলো পথ রয়েছে। আমাদের বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হবে না এটা ঠিক করে নির্ণয় করা যে, তারা কোন পথে এগোচ্ছে। সব পথে সেনা মোতায়েন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রচণ্ড মতবিরোধ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে একমত হয়ে তাকে তার মতো কাজ করতে দিলাম।

বিকালের দিকে খবর এলো, ভারতের ট্যাংক যুক্ত মূল বাহিনীর যে অংশ নলদ্রাগ পার করে দালাম হয়ে হুসনাবাদের দিকে এগোচ্ছিল, তারা তাদের দিক পরিবর্তন করে উত্তরে কালিয়ানির দিকে এগোচ্ছে। তাদের এই চাল ছিল পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত এবং এতে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। ম্যাপে দেখা গেল—তাদের পথে বিশাল এলাকাজুড়ে রয়েছে এবড়ো-থেবড়ো ও অসমতল রাস্তা, যা দিয়ে ট্যাংক কিংবা অন্যান্য যানবাহন সহজে যাতায়াত করতে পারবে না। তাহলে কালিয়ানির দিকে তাদের এগোনোর মতলবটা কী? কালিয়ানির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। আমরা কেবলই অনুমানের ওপর নির্ভর করছিলাম যে, সেখানে কী হচ্ছে।

সেদিন বিকালে আমি নিজামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি দুঃসংবাদ পেলাম। একদম উত্তর-পূর্বে আওরঙ্গবাদ শহরটি ভারতীয় বাহিনী দখল করেছে। খবরটি শুনে আমরা দুজনেই এক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেলাম। নিজামের চোখ দিয়ে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমিও ভেতরে একই ব্যথা অনুভব করছিলাম। কিন্তু ভেতরের বেদনা আমি বাইরে সেভাবে প্রকাশ করতে পারছিলাম না। আমি আর্মি হেডকোয়ার্টারে চলে গেলাম। জানতে পেরেছিলাম যে, জালনা এখনও আমাদের হাতে আছে। কিন্তু ভারতের দুটি মোটোরাইজড বাহিনী এই শহরের দিকে এগিয়ে আসছে উত্তর ও পূর্ব থেকে।

https://nagorikpathagar.org

বুঝতে পেরেছিলাম, হয় রাতের মধ্যে অথবা পরদিন জালনা ভারতের হাতে চলে যাবে। অন্য একটি দল এগিয়ে আসছিল বীর-এর দিকে, বীর-এর ফলাফলও একই দাঁড়াবে। আমাদের সেনাপ্রধান একটানা ৩৬ ঘণ্টা ধরে তার ডেস্কে কাজ করে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে বিশ্রাম নেওয়ার উপদেশ দিলাম এবং সব নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে তুলে নিলাম। আমি চিফকে জানালাম যে, শুধু যদি খুব গুরুতর কিছু ঘটে, তবেই তাকে ডেকে পাঠাব।

পশ্চিমে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তখন আরও কিছু সংবাদ এসে পৌঁছেছে। পূর্বের রুটে দুটি খাল ছিল, যা সেচের জন্য ব্যবহার করা হতো। আমার আদেশে সেখানে বোমা বিস্ফোরণ করে খালের সাহায্যে রাস্তা বন্ধ এবং চলাচলের অযোগ্য করে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে বেশ কিছু ট্যাংক এবং যানবাহন সেখানে আটকা পড়েছিল। ভারতীয় বাহিনীর অন্য ইউনিটগুলো হুজুরাবাদ-মিরিয়াগুদা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এসে মুসির পাথর দিয়ে বাঁধাই করা রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে আসছিল। মুসির পাথরে বাঁধাই করা বাঁধের পূর্ব কূল রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনী তেমন কোনো কাজেই এলো না। এমনকি তাদের কাছ থেকে কোনো খবরই পাওয়া গেল না।

যে বাহিনীটা এগিয়ে আসছিল, তাদের সামনে তখন দুটি পথ ছিল। তারা চাইলে উত্তরের দিকে গিয়ে নলখোন্দা পার করে নাকরিকালে গিয়ে তাদের মূল বাহিনীর সঙ্গে একত্রিত হতে পারত, যারা সুরিয়াখাত হয়ে এগিয়ে আসছিল। অথবা আরও পূর্বে এগিয়ে গিয়ে যেসব রাস্তা রাজধানীর দিকে চলে আসে, তার মধ্যে যেকোনো একটি হয়ে এগিয়ে যেতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় দিন রাতেও তাদের অগ্রগতির তেমন কোনো খবর পাওয়া গেল না। অপরদিকে আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দলকে দায়িত্ব দিলাম মুসি নদীর ওপর দিয়ে যে সেতু সুরিয়াখাত-নাকরিকাল রাস্তায় মিশেছে, তার কিছু অংশ ধ্বংস করে দিতে। তারা সেতুটির প্রধান দুটি তোরণ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল। ব্রিজ ধ্বংস সত্ত্বেও যাতে তারা নদী পার করতে না পারে, সেজন্য হিমায়েত সাগর লেকের যে বাঁধটি ছিল, তার ফ্লাড গেট খুলে দিতে বললাম।

সন্ধ্যায় নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি হেডকোয়ার্টারে চলে গেলাম। সেখানে দেখতে পেলাম, সেনাপ্রধান কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর তার ডেস্কে ফিরে এসেছেন। কাসেম রিজভীর সঙ্গে যোগাযোগ হলো এবং আমি তার কাছে প্রথমবারের মতো কিছু রাজাকার প্রস্তুত করে দিতে বললাম। কারণ, দক্ষিণ ও পশ্চিম শাখায় আর কোনো বাহিনী উপস্থিত ছিল না। তার জবাব ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি বললেন, যত দরকার তত পাঠানো হবে, কিন্তু তাদের কিছু

https://nagorikpathagar.org

অস্ত্র সরবরাহ করতে হবে। তিনি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন, রাজাকারদের চারটি ব্যাটালিয়ন প্রস্তুত আছে প্রয়োজন মোতাবেক যেকোনো স্থানে যুদ্ধের জন্য। শুধু তা-ই নয়, রাজাকারদের প্রথম ব্যাটালিয়নের মধ্যে ছিল তার দুই ছেলে এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন, দলটি যে কোনো বিপদের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। আর্মি চিফের অনুরোধে গভীর রাতে আমি সেখান থেকে চলে গেলাম বিশ্রামের উদ্দেশ্যে। আমি অফিসে গেলাম। সেখানে আমার কর্মচারীরা করাচিতে অবস্থিত হায়দারাবাদের রাষ্ট্রদূত মুসতাক আহমেদের কাছ থেকে পাওয়া এবং তাকে পাঠানোর জন্য বিভিন্ন গোপন তথ্যের কোডিং এবং ডিকোডিংয়ে ব্যস্ত ছিল।

সেই একমাত্র মাধ্যম ছিল, যার দ্বারা বেতার ব্যবহারে বহির্বিশ্বের সঙ্গে হায়দারাবাদ যোগাযোগ করতে পারত। তার সঙ্গে তেমন কোনো কর্মকর্তা সেখানে ছিল না এবং গোপন তথ্য কোডিং ও ডিকোডিংয়ের জন্য তিনি তার পরিবারের সাহায্য নিতেন। তার সঙ্গে প্রতি ঘন্টায় যোগাযোগ করা হতো এবং মীর নওয়াজ জং-এর সাহায্যে তিনি হায়দারাবাদের প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। সবচেয়ে কঠিন কাজটি ছিল মুসতাকের জন্য। তার দায়িত্ব ছিল হায়দারাবাদের ঘটনাবলি এবং খবরাখবর পাকিস্তানের সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং পাকিস্তানি সরকার যেন হায়দারাবাদকে সাহায্য করে সেদিকে লক্ষ রাখা। এ ছাড়াও তার দায়িত্ব ছিল এটা নিশ্চিত করা, যেন সেখান থেকে বিভিন্ন সাহায্য, অস্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ঠিকমতো এখানে এসে পৌঁছে। তার সঙ্গে কাজ করে আমি এটাই বুঝতে পেরেছিলাম যে, তিনি ছিলেন অসম্ভব পরিশ্রমী। তিনি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছিলেন।

হায়দারাবাদ খুব আশাবাদী ছিল যে, জাতিসংঘ দুর্বলের পাশে এসে দাঁড়াবে এবং তাদের সাহায্য করবে। হায়দারাবাদের প্রতিনিধিবর্গ প্যারিসের দিকে রওনা হয়েছিল, যেখানে জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ১৩ সেপ্টেম্বরে সেখানে তাদের পৌঁছার কথা, যা ছিল তখন ভারতের আক্রমণের এক সপ্তাহ আগে। কিন্তু মঈন নওয়াজ জংকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু কায়দে আজম জিন্নাহ হঠাৎই মৃত্যুবরণ করেছেন, এমনটি হতে পারে যে, ভারত আগেভাগেই তাদের আক্রমণ চালাবে। আমি জানতাম যে, তারা এক সেকেন্ডেরও অপব্যবহার করবে না। কিন্তু লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করে তারা যখন কায়রো পর্যন্ত পৌঁছেছিল, ততক্ষণে আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেখান থেকে লন্ডনে দ্রুত পৌঁছার উদ্দেশ্যে অন্য একটি বিমানে করে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনই, তিনি যখন ত্রিপোলিতে পৌঁছেন তখন যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বিমানটিকে কয়েক ঘন্টা বিরতিতে থাকতে হয়।

https://nagorikpathagar.org

শেষমেশ ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় দেরি করেই তারা লন্ডনে পৌঁছেছিলেন। সেখান থেকে সবার আগে যে বিমানটি ছাড়ে, তাতে করে ১৪ তারিখ সকালে আমাদের প্রতিনিধিরা রওনা হয়েছিল প্যারিসের উদ্দেশে। প্যারিসে নেমেই মঈন নওয়াজ জং জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সব আনুষ্ঠানিকতাকে দ্রুত সেরে শুধু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দিকেই নজর দেওয়া হচ্ছিল। তাদের পৌঁছানোর পর নিরাপত্তা পরিষদ প্রথম যখন বসবে, তার তারিখ ছিল ১৬ সেপ্টেম্বর বিকাল। মঈনের দায়িত্ব ছিল প্রতিনিধিদের পক্ষ হয়ে যখনই প্যারিসে তার দরকার, তখনই সেখানে উপস্থিত থাকা।

১৫ সেপ্টেম্বর সকালে পশ্চিম থেকে আসা বিপদ আরও ভয়ংকর রূপ ধারণ করল। পূর্বে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোনো খবর এলো না। ভারতীয় মূল বাহিনী যেটা দালাম থেকে কালিয়ানির দিকে মার্চ করে আসছিল, তাদের সম্পর্কেও কোনো খবর জানা যাচ্ছিল না। নিজামকে সেদিন সকালে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। কমান্ডারকেও দেখে মনে হচ্ছিল, তার আত্মবিশ্বাস আর আগের মতো নেই। নিজাম পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার মতামত চাইলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা নিরাপত্তা পরিষদের মতামত আসা পর্যন্ত ভারতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব কি না। আমি নিজামকে জবাব দিলাম—আমি আশা করি না যে নিরাপত্তা পরিষদ এক সপ্তাহের আগে তেমন কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারবে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত আমাদের যে করেই হোক ভারতের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতেই হবে। আর্মি চিফ বললেন, পূর্ব থেকে আসা আক্রমণ ততদিন কিংবা তারও বেশি সময় ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু পশ্চিমের অবস্থা নিয়ে তিনি খুব চিন্তিত। কারণ, বলতে গেলে সেখানে পাঠানোর মতো আর কোনো সৈন্যই তার কাছে নেই। তিনি বললেন, কিন্তু যা-ই হোক ভারতকে আরও এক সপ্তাহ ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব নয়।

একটি ছোটো বৈঠকের পর এডিসি কর্তৃক জানতে পারলাম, দিল্লিতে রেডিওতে প্রচার হচ্ছে, ভারতের মূল বাহিনী ঐতিহাসিক শহর বিদর-এর কাছে চলে এসেছে। এডিসির কথা বিশ্বাস করতে না পেরে পাশের একটি রুমে চলে গেলাম, যেখানে রেডিওতে দিল্লির খবর সম্প্রচারিত হচ্ছিল। পুরো সংবাদজুড়েই ছিল ভারতীয় বাহিনী হায়দারাবাদে কী করছে তার খবর। শেষে বলা হলো, ভারতের মূল বাহিনী ঐতিহাসিক শহর বিদর-এর কাছে চলে এসেছে। আমি আমার ডেস্কে ফেরার পরপরই সেনাপ্রধানের একটি কল পেলাম। তিনি বললেন, খবর পাওয়া গেছে কালিয়ানি-বিদর রাস্তা ধরে বিশাল ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে আসছে। কালিয়ানি-বিদর সড়কের নাম শুনে আমি অবাক হলাম।

https://nagorikpathagar.org

ম্যাপে লক্ষ করে দেখলাম, সেখানে কোনো কালিয়ানি-বিদর সড়ক বলে কিছু নেই। দ্রুত ফোন লাগালাম প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে। তিনি জানালেন, সেখানে একটি নতুন রাস্তা করা হয়েছিল, যা নতুন মানচিত্রে ছাপা হওয়ার কথা। আমি হতবাক হলাম। আমি জানতাম না যে, কালিয়ানি-বিদর সড়ক নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তা ব্যবহারের উপযোগী। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান এ সম্পর্কে আরও কম জানার কথা বললেন। এমনকি সেনাবাহিনী রিকনসেন্স এবং ইন্টেলিজেন্স পর্যন্ত এটা সম্পর্কে জানত না। দেখা গেল, এ কথা জানত শুধু ভারতীয় বাহিনী! এ কী করে সম্ভব!

এটি ছিল তখন পর্যন্ত আমার জন্য সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার। বিদর ছিল একটি সাপ্লাই বেস এবং সেখানে কোনো প্রতিরক্ষাবাহিনী ছিল না বললেই চলে। কালিয়ানি থেকে বিদর-এর রাস্তা ছিল এমন যে, সেখানে অল্পসংখ্যক প্রতিরক্ষাবাহিনী থাকলেই সেটা পার করা ভারতের জন্য খুব কঠিন হয়ে যেত। কিন্তু এখন সহজেই ভারত সেই রাস্তা পার হয়ে বিদরে চলে এসেছে। এই রাস্তা ধরে আসার ফলে ভারতীয় বাহিনী লাটুর-বিদর পথে যে বাঁধযুক্ত উঁচু রাস্তা ছিল, সেখানে আমাদের কঠিন নিরাপত্তাব্যবস্থাকে এড়িয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারা পৌঁছে যাবে সুরক্ষিত হুসনাবাদের কাছে। খুবই একটি জটিল সমস্যা দেখা দিলো। বিদর ছিল জহিরাবাদ থেকে বারো মাইল দূরে, অন্যদিকে জহিরাবাদ থেকে হুসনাবাদের দূরত্ব ছিল ৪০ মাইলের বেশি। সেনাপ্রধান এরচেয়েও অনেক সহজ পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেনি। এই কঠিন অবস্থা কি তিনি সামাল দিতে পারবেন!

খুব তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে আর্মি সিনিয়র এবং জেনারেল স্টাফদের একটি মিটিং ডাকা হলো। তখন বলতে গেলে লাটুর ইউনিটটি আর আমাদের হাতে নেই। বিদর ছাড়া সেখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য তাদের আর কোনো পথ বাকি ছিল না। তখন প্রশ্ন শুধু একটিই; হুসনাবাদের ব্যাটালিয়নদের জহিরাবাদে নেওয়া সম্ভব কি না? যেখানে তারা জহিরাবাদ-হায়দারাবাদ সড়ক প্রতিরক্ষায় কাজ করবে। সেখানে এমন কিছু স্থান ছিল, যেখান থেকে প্রতিরক্ষা করার জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যেত। আর্মি কমান্ডারের মতামত এমনটি ছিল যে, ৫০ মাইল দূরত্ব এক রাতে অতিক্রম করার মতো শক্তি ও উদ্যম তাদের মধ্যে নেই। কিন্তু সেনাপ্রধানের সাথে দ্বিমত পোষণ করল অন্যান্য অফিসার। জেনারেল স্টাফের জুনিয়র কর্মকর্তাদের মতে, এটি তেমন অসম্ভব কোনো ব্যাপার ছিল না।

https://nagorikpathagar.org

তর্কে বলা হয়েছিল যে, ভারতীয় বাহিনীও তখন খুব ক্লান্ত থাকবে এবং হুসনাবাদের সৈনিকদের পথ তারা রুখে দাঁড়াতে পারবে না। শেষ সিদ্ধান্ত ছিল আমার। আমি আদেশ করলাম, যাতে হুসনাবাদের সৈনিকরা ২৫ পাউন্ডার গান এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্র নিয়ে জহিরাবাদের সব পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থান করে। আরও আদেশ দিলাম, যাতে বিদর থেকে যতখানি সম্ভব সরঞ্জামাদি নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়া হয়। তখন প্রশ্ন এমন হয়ে দাঁড়াল যে, যদি ভারতীয় বাহিনী বিদর থেকে জহিরাবাদের রাস্তা দিয়ে না এসে অন্য কোনো রাস্তা দিয়ে আসে, তখন কী হবে? যদি এমনটি হয় তবে খুব বড়ো বিপদে পড়তে হবে। কিন্তু সবকিছুর প্রতিরক্ষা আমাদের সম্ভব না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আর্মি চিফ আমার সঙ্গে একমত ছিলেন, যেহেতু সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে যে, ভারত জহিরাবাদ-হায়দারাবাদের রাস্তা দিয়ে এগোবে, সেহেতু সেখানেই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমি আমার ডেস্কে ফিরে এলাম। ঘটনাগুলো এত ত্বরিতগতিতে এগিয়ে আসছিল যে, কোনো প্লান তৈরি করার সময় পাওয়া যাচ্ছিল না। নিরাপত্তা পরিষদও কি তাদের মতামত তেমনি দ্রুত প্রস্তুত করতে পারবে এবং তাদের কোনো মতামত আদৌ কি কোনো কাজে আসবে? যদি এমনই হয়, তবে সামনে দুটি পথ থাকবে। একটি হলো, ভারত যদি কোনো যৌক্তিক শর্ত দেয় তবে তা মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং ভারত যদি আমাদের আত্মসমর্পণে কোনো সাড়া না দেয়, তবে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে। দ্বিতীয়টি হলো, তখনই সব অস্ত্র পরিত্যাগ করে ভারতের আক্রমণ ঠেকানোর কোনো প্রচেষ্টা না করে অপেক্ষা করতে হবে। আমি প্রথমটিই বেছে নিয়েছিলাম।

১৫ তারিখের বিকালে ভারতীয় নেতাদের উদ্দেশ্য করে আমার আকুতিমূলক একটি বাণী রেডিওতে প্রচার করা হয়। আমি মুসতাক আহমেদকে খবর পাঠিয়েছিলাম—তিনি যেন পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করেন, যাতে তারা ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং ভারতকে সামনে আর কোনো রক্তপাত ঘটানো থেকে বিরত থাকার জন্য বলে। পরিস্থিতি সাপেক্ষে তারা যেমন শর্ত দিতে চায়, তেমনি শর্ত যাতে তারা পেশ করে। আমার আবেদন রেডিওতে বেশ কয়েকবার প্রচার করা হয়। কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত দিল্লি রেডিওতে তার কোনো জবাব সম্প্রচার করা হলো না।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি নিজামের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তার মনের অবস্থা ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্তিত হচ্ছিল। আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, নিরাপত্তা পরিষদের কাছ থেকে এখনও কোনো ধরনের আশা রাখার মতো পরিস্থিতি

https://nagorikpathagar.org

আছে কি না। সেদিন সকাল থেকেই আমি কোনো খবরই পাইনি। সুতরাং তাকে বলার মতো আমার কাছে তেমন কিছুই ছিল না। আমি তখনও মনে করছিলাম যে, এখনও হয়তো আশা আছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব আমাদের আশা রাখতে হবে।

পশ্চিম ও দক্ষিণ যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা তেমন একটা সুবিধার দেখাচ্ছিল না, কিন্তু পূর্বের মতো এত খারাপও আবার ছিল না। গভীর রাতে আমি আর্মি হেডকোয়ার্টারে গেলাম। দেখলাম আর্মিপ্রধান তখন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। জেনারেল স্টাফরা যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রাতারাতি পরিস্থিতিতে তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না বুঝতে পারলাম। মুসতাক আহমেদ বিমানে করে কিছু শক্তিশালী ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিমান থেকে সেসব বিশাল আকৃতির অস্ত্র নামিয়ে জোড়া লাগাতে অনেক সমস্যা হচ্ছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলোকে আর্মি হেডকোয়ার্টারেই আনা হলো। আমি নিজে সেগুলো পরিদর্শন করে দেখছিলাম। তখন মনে মনে ভাবছিলাম, যদি আর কিছুদিন আগে এগুলো পাওয়া যেত। যা-ই হোক, সেগুলোকে খুব দ্রুত পশ্চিমে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে যাওয়া হলো। যেখানে প্রকৃতপক্ষে কোনো বড়োসড়ো বন্দুক-কামান কিছুই ছিল না।

https://nagorikpathagar.org

হায়দারাবাদের ওপর ভারতীয় আক্রমণ শুরুর চতুর্থ দিন। হায়দারাবাদের অবনতিশীল পরিস্থিতি, নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা, বিশ্বজুড়ে ক্ষোভ ও নিন্দার আকস্মিকভাবে মীর নায়েক আলিকে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়ার জন্য নিজামের আহ্বান এবং অফিসারশূন্য আর্মি হেডকোয়ার্টারের বর্ণনাই আজকের পর্বের উপজীব্য। যথারীতি মীর লায়েক আলির স্মৃতিচারণই আমাদের সবচেয়ে বড়ো অবলম্বন :

ভারতীয় বাহিনীর হায়দারাবাদ আক্রমণ ক্রমেই আন্তর্জাতিক খবরে রূপ নিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকার শিরোনাম হিসেবে খবরগুলো ছাপা হতে লাগল। প্যারিসে আয়োজিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যেখানে কি না ভারত ও হায়দারাবাদ উভয় দেশের প্রতিনিধিরা অবস্থান করছিল, সেখানে ভিড় জমল সাংবাদিকদের। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে দেখা গেল যে, সাধারণ জনগণ ভারতের এই আচরণে ক্ষুব্ধ। এর প্রতিফলন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের জনগণের মধ্যে ছিল খুবই প্রবল। দেখার বিষয় এই হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, প্রায় সব দেশের মানুষের মধ্যে বিষয়টিকে ঘিরে যে অসন্তোষমূলক ভাব বিরাজ করছিল, তার প্রভাবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বিষয়টিকে মূল্যায়ন করে কোনো দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না।

এ বিষয়সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ প্যারিসে আসতে শুরু করল এবং নিরাপত্তা পরিষদ শেষ পর্যন্ত হায়দারাবাদের বিষয়টি নিয়ে সভা ডাকল, যা নির্ধারিত করা হলো ১৬ সেপ্টেম্বর। অন্তর্বর্তীকালে মঈন নওয়াজ জং আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন পরিষদের সব সদস্যের সঙ্গে একজন একজন করে হায়দারাবাদ প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করে তাদের বোঝানোর জন্য। আলোচনায় দেখা গেল, চীন ভারতকে সমর্থন করছিল এবং রাশিয়া বাদে অন্যান্য সব দেশের প্রতিনিধিরা ছিল ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে ভারতের প্রতিনিধিরা রামস্বামীর নেতৃত্বে পর্দার আড়ালে থেকে যথেষ্ট সক্রিয়ভাবে তাদের মতো কাজ করে যাচ্ছিল। শেষমেশ নিরাপত্তা পরিষদ কী সিদ্ধান্ত নেবে, তখনও তা বলা যাচ্ছিল না। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল যে, বেশির ভাগ সদস্যই ভারতীয় আগ্রাসনের

https://nagorikpathagar.org

বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, সিরিয়া, আর্জেন্টিনা ও কানাডার প্রতিনিধিরা সবাই ছিলেন ভারতীয় আগ্রাসনের বিপক্ষে। ব্যতিক্রম ছিল চীন, তারা ভারতের পক্ষে কথা বলছিল এবং অন্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করছিলেন না।

এবার রণাঙ্গনের দিকে দৃকপাত করা যেতে পারে। মুসী নদী পারাপারের সেতুটি ১৫ সেপ্টেম্বর উড়িয়ে দেওয়ার আগেই সুবিয়াপেত থেকে নিরাপত্তা বাহিনীকে সরিয়ে নদীর পশ্চিম তীরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হিমায়েত সাগর লেকের ফ্লাডগেট খুলে দেওয়া হয়, যাতে পূর্ব দিক থেকে আগত শত্রুপক্ষ সহজে সেতু পার হয়ে এগিয়ে আসতে সক্ষম না হয়। লেক ও ব্রিজের মধ্যে দূরত্ব ছিল ১০০ মাইল এবং হিসাব করা হলো যে, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সেতুর কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পৌঁছাতে সময় লাগবে তিন দিন। যে পরিমাণ পানি দরকার ছিল নদীর তীর ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য, সে পরিমাণ গভীরতা সৃষ্টি করতে গেলে লেকটি প্রায় শুকিয়ে যাবে। ফলে এই অপারেশনটির কিছু ক্ষতিকর দিকও ছিল। আমি সেনাবাহিনীর প্রধানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ফ্লাডগেট খুলে রাখা কি খুবই জরুরি? তার বক্তব্য তখনও ছিল জোরালো—নদীর তীর ভাসিয়ে দেওয়া উচিত। তিনি জানালেন, সব নিরাপত্তা বাহিনীকে সরিয়ে আনা হয়েছে। তাদের অবস্থান এখন নাকরাকালে। যাতে তারা সুরিয়াপেত ও দক্ষিণে মারিয়ালগুদা ও নলদ্রোগ থেকে আসা শত্রুবাহিনীকে প্রতিহত করতে পারে।

এতৎসত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে ভাঙা সেতুটিতে কোনো প্রতিরক্ষাবাহিনী অবস্থান করছিল না। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার মধ্যেই সংবাদ এলো যে, ভারতীয় বাহিনী ভাঙা সেতুটির স্থানে একটি অস্থায়ী সেতু বসাতে সক্ষম হয়েছে। তারা এগিয়ে আসছে। তখন সেনাপ্রধান বলল—তাদের উচিত ছিল পশ্চিম তীরে কিছু নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা, এতে তারা সেতু স্থাপন কাজে ভারতকে বাধা দিতে পারত। কিন্তু ততক্ষণে খুব দেরি হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলাম যাতে হিমায়েত সাগর লেকের ফ্লাডগেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। হতাশার সঙ্গে সেনাপ্রধানকে বললাম, নাকারাকালের পূর্ববর্তী পাহাড়ি এলাকায় যতদূর সম্ভব নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য।

১৬ সেপ্টেম্বর সকালে ভারতের মূল বাহিনী বিদর ছাড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। দুপুরের মধ্যে তারা বিদর-জহিরাবাদ রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করল। ততক্ষণে নিরাপত্তা বাহিনীর এক অংশ এবং টুয়েন্টি ফাইভ পাউডার বন্দুক, যেগুলো পূর্বে হুমনাবাদে অবস্থান করছিল, সেগুলোকে সরিয়ে জহিরাবাদের

https://nagorikpathagar.org

পেছনে নিয়ে আসা হলো। এগুলো ছিল একজন ব্রিগেডিয়ারের কমান্ডের অধীনে, যাকে বিদরে অবস্থান করতে বলা হয়েছিল। তাকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল পাহাড়ি এলাকায় শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এবং একজন সৈন্য জীবিত থাকা পর্যন্ত সেই স্থানের নিরাপত্তার লক্ষ্যে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। হুমনাবাদ থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর বেশির ভাগ অংশই সরিয়ে আনা হয়েছিল ভারতীয় মূল বাহিনীর বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য। জহিরাবাদের ভৌগোলিক অবস্থা ছিল হুমনাবাদের মতোই ভালো। আশা করা হচ্ছিল যে, সঠিক সঠিক স্থানে সৈনিকদের দাঁড় করাতে পারলে ভারী ধরনের প্রতিরোধব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব।

আমি একবার সকালে এবং পরে দুপুরে নিজামের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না। তার মধ্যে যোগাযোগে অনিচ্ছুক একটা ব্যাপার কাজ করছিল। আগের দিন দুপুরে বেতার মাধ্যমে আমি ভারতের নেতাদের উদ্দেশ্য করে যে বার্তা সম্প্রচার করেছিলাম, তার কোনো জবাব দিল্লি থেকে সম্প্রচারিত মাধ্যমে আসছিল না। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই অপ্রত্যাশিত অগ্রগতি দেখে নিজাম ধরেই নিয়েছিলেন, ভারতীয়রা আমার সম্প্রচারে সাড়া দেবে না। তিনি এ বিষয়েও একমত ছিলেন যে, এখন পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কোনো সেনাপত্যপূর্ণ বা রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

পাকিস্তান কি তখন এটা বুঝতে পারছিল না যে, যেহেতু ভারতের সিংহভাগ সামরিক শক্তি হায়দারাবাদে ব্যস্ত, সেই সুযোগে তাদের সামরিক বাহিনী অন্তত্তপক্ষে পাঠানকোট-জম্মু রোড এবং সেতুর পুরোভাগ নিজেদের দখলে নিয়ে নিতে পারে? এর ফলে পুরো কাশ্মীরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যাবে, সেখানকার পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে চলে আসবে। এতে পাকিস্তানের অনেক সুবিধা হবে। কিন্তু হায়দারাবাদের কোনো সুবিধা হবে না। নিজাম আমার সঙ্গে একমত হলেন। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে, জিন্নাহর মৃত্যুর পর এত দ্রুত এত বড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো পাকিস্তানে এখন পর্যন্ত কেউ নেই। আমিই একমাত্র কিছুটা আশাবাদী ছিলাম; আমি আশা করছিলাম যে, ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কোনো একটা ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু নিজাম আমার সঙ্গে একমত ছিলেন না।

মন্ত্রিসভার একটি আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো পরিস্থিতি বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে। ধারণা করা হচ্ছিল, নিরাপত্তা পরিষদ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। আশা ও হতাশার একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া মন্ত্রিসভায় উপলব্ধি করা যাচ্ছিল।

https://nagorikpathagar.org

সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল সেদিন বিকালে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের জন্য, সেখানে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার জন্য। প্যারিস থেকে আসা সব সংবাদ যাতে করে সেনাপ্রধানের কাছে পৌঁছে যায়, সেটা নিশ্চিত করা হয়েছিল। এই মারাত্মক পরিস্থিতিতে তার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা তাকে ভালোভাবেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

খবর এলো যে, ভারতীয় বাহিনীর দক্ষিণ ভাগ এগিয়ে আসছে এবং তারা পূর্ব দিক থেকে অগ্রসর না হয়ে পশ্চিম দিকে মুখ নিয়েছে। তখন পর্যন্ত বলা যাচ্ছিল না, তারা কি নলদ্রাগ হয়ে মূল ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে একত্রিত হবে, নাকি তারা পশ্চিমেই এগোতে থাকবে এবং দিওয়ারকোন্দ হায়দারাবাদ রোডে গিয়ে উঠবে। ব্যথিতচিত্তে জানলাম, ওই এলাকায় আমাদের কোনো ধরনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল না। আমি ঠিক করলাম, যত দ্রুত সম্ভব রাজাকারদের একটি বাহিনী সেখানে পাঠাব। তাদের কিছু সুদক্ষ আর্মি অফিসারের আওতায় এনে সেখানে পাঠালে ভালো ফল পাওয়া যাবে। তাদের খাদ্য, যাতায়াত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দায়িত্ব দেওয়া হলো কিছু বেসামরিক কর্মকর্তার হাতে, যারা প্রশংসনীয়ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু রহস্যজনকভাবে কোনো ভারতীয় বাহিনী সেই অঞ্চলের দিকে এগোল না।

হায়দারাবাদের সেনাদের কাছে স্বল্পসংখ্যক ট্যাংক-মাইন ছিল এবং আমি আদেশ দিলাম সেগুলোকে জহিরাবাদ হায়দারাবাদ রোড ও নাকরাকাল-হায়দারাবাদ রোডে সুপরিকল্পিতভাবে পুঁতে রাখার জন্য। সেনাবাহিনীর জেনারেল স্টাফ আগেই যেসব রাস্তা দিয়ে ট্যাংক আসতে পারে, সেসব স্থানে মাইন পুঁতে রাখার মানচিত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এক আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা কাজে লেগে গেলেন। পরদিন সকালের আগেই কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

কাজ এতই বেশি ছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন সময় বুঝি উড়ে চলে যাচ্ছে। নিজামের কাছ থেকে খবর এলো এবং তিনি যখনই সম্ভব তার সঙ্গে আমাকে দেখা করার জন্য বলেছিলেন। আমি এরই মধ্যে দুবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তার সঙ্গে তৃতীয়বার সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেতে পেতে অনেকটা বিকাল হয়ে গেল। তবে পূর্ববর্তী সাক্ষাৎগুলোতে তাকে যেমন মনভোলা ও উদাস দেখাচ্ছিল, এবারে তার চাইতে অনেক ভালো দেখাচ্ছিল। আমি পরিস্থিতির সব তথ্য-উপাত্ত তার সামনে পেশ করলাম। তার সঙ্গে আধঘণ্টা পরপর সেনাপ্রধানের যোগাযোগ হচ্ছিল। আর্মিপ্রধান তাকে সম্প্রতি ঘটিত সব তথ্য দিয়ে আপডেটেড রাখছিলেন। নিরাপত্তা পরিষদের ব্যাপারে আমাকে

https://nagorikpathagar.org

জিজ্ঞাসা করতেই আমি তাকে জবাব দিলাম, প্যারিসের সময় আমাদের সময়ের চেয়ে পাঁচ ঘণ্টা পিছিয়ে এবং তাদের বৈঠক আরম্ভের আরও চার ঘণ্টা সময় বাকি আছে। তাকে জানালাম যে, প্যারিসের কাছ থেকে খবর পেতে পেতে পরদিন সকাল হয়ে যাবে। কথাটি শুনে তিনি কিছু সময় চুপ হয়ে রইলেন। আমিও চুপ থাকলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমার সব হিসাবই ভুল। পাকিস্তান নিশ্চুপ দর্শক হয়ে বসে আছে। আমাদের সৈন্যরা হতাশাজনকভাবে যুদ্ধ করছে। অপরদিকে ভারতীয় বাহিনী ধেয়ে আসছে রাজধানীর দিকে। নিরাপত্তা পরিষদের কোনো খবর নেই। তিনি তখন বুঝতে পারলেন, তার ও তার পরিবারের নিরাপত্তা এখন বিপর্যস্ত প্রায়। আমাকে বললেন, সময় এসেছে আমার সঙ্গে দ্বিধাহীনভাবে কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করার।

তিনি বললেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনই। সামনে পথ কেবল দুটি। প্রথমটি হলো আমি ও আমার দ্বারা শাসিত সরকার ঘোষণা দেবে যে, তারা রাষ্ট্রের সব দায়িত্ব তাদের হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে। তখন তিনি সব দায়িত্ব নেবেন। তিনি তখন পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখবেন কী করা যায়। যতদূর সম্ভব ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে বৈঠক করে কিছু একটা করবেন। অথবা আমি যদি একমত না হই, তবে তিনি তার সব দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন, সব দায়িত্ব তখন আমার ঘাড়ে এসে পড়বে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভারতের সঙ্গে কোনো ধরনের রাজনৈতিক নিষ্পত্তির কথা কি তিনি বিবেচনা করছেন? তিনি আমাকে শুধু এতটুকুই বললেন যে, তিনি বিচক্ষণতার আশ্রয় নেবেন। পরিস্থিতি বিবেচনার যতটুকু সম্ভব রক্ষার চেষ্টা করবেন। তিনি আরও কিছু বলে আমাকে বললেন নয়টার মধ্যে আমার মতামত তাকে জানাতে, যা হতে হবে সুস্পষ্ট এবং চূড়ান্ত। আমি তাকে জানালাম যে, আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত ওই সময়ের মধ্যে দিতে পারব। কিন্তু যেহেতু সরকারি বিষয় এটা, সেহেতু রাত দশটা নাগাদ মন্ত্রিসভার একটি বৈঠক আয়োজন করার পরেই তাকে অফিশিয়াল মতামত দিতে পারব। আমার কথায় তাকে একটু হতাশ দেখাল। কিন্তু তিনি রাজি হলেন শেষমেশ।

নিজামের সাথে সাক্ষাতের পর আমি বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। আর্মি হেডকোয়ার্টারে পৌঁছেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম যে, যা-ই ঠিক করব তা হবে বাস্তবসম্মত। নিজামকে ছাড়া পরিস্থিতির কী হবে তা নিয়ে ভাবলাম এবং ভেবে পেলাম যে, পরিস্থিতি নিজামকে ছাড়া আরও দ্বিগুণ খারাপ হয়ে যাবে। সে রকম পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর কী হবে এবং সেনাপ্রধানের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া কেমন হবে? আমি কি নিশ্চিন্তে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে তার

https://nagorikpathagar.org

সঙ্গে বিষয়াদি নিয়ে সলাপরামর্শ করতে পারব? এসব বিষয়ই আমার মাথার মধ্যে তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল।

কোনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তখনও পর্যন্ত কোনো অগ্রগতির খবর এসে আর্মি হেডকোয়ার্টারে পৌঁছেনি। সেনাপ্রধান কিছু সময়ের জন্য তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। এবং সেই সময় একজন স্টাফ অফিসারের সঙ্গে আমার কথোপকথন হলো। কথা বলে জানতে পারলাম, তাদের সবার ধারণা এই যে, বর্তমান ধারার পরিস্থিতি যে গতিতে এগুচ্ছে, সেভাবে এগোতে থাকলে আমাদের রাজধানীতে ভারতীয় বাহিনীর পৌঁছতে অন্তত পক্ষে তিন দিন লাগবে। জানতে পারলাম, তারা সবাই নিরাপত্তা পরিষদের কাছ থেকে কী আশা করা যায়, তা জানতে আগ্রহী।

সেনাবাহিনী প্রধান শিগ্‌গিরই ফিরে এলেন। জানালেন যে, পূর্ব দিকে আমাদের বাহিনী খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। যত দ্রুত আশা করা হয়েছিল তার চেয়েও দ্রুততরভাবে ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে আসবে। তা পশ্চিম থেকে না হয়ে হবে পূর্ব থেকে। কাসেম রিজভীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হলো এবং তিনি জানালেন যে, এখন পর্যন্ত এক হাজার রাজাকার আছে আমাদের সাহায্য করার জন্য। আমি সব রাজাকার ও স্বেচ্ছাসেবক বেসামরিক বাহিনীকে আদেশ দিলাম পূর্ব দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যেতে। শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য সেখানে মাইন পুঁতে রাখতে এবং বিভিন্ন স্থানে গর্ত খুঁড়ে রাখতে, যার পরিকল্পনা আগে থেকেই করে রাখা হয়েছিল। এরপর আমি আর্মি কমান্ডার ও তার স্টাফদের কাছ থেকে সেনা মোতায়েনের সুনির্দিষ্ট খবরাখবর নিলাম। পূর্বে জহিরাবাদের পাঘড়ি এলাকায় নতুন এইসব প্রতিরক্ষাবাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে এবং তারা একজন ব্রিগেডিয়ারের আওতায় কাজ করবেন; যিনি পূর্বে বিদরের যুদ্ধ ময়দানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। আর্মি কমান্ডার তার কাজকর্ম দেখে সন্তুষ্ট ছিলেন। তার সংবেদনশীলতা প্রশংসার যোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

সব ডিফেন্ডিং ইউনিটকে টিনের কৌটায় ভরা খাবারের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছিল যুদ্ধের শুরু থেকেই। তাদের গরম টাটকা খাবার সরবরাহ করা অতি জরুরি হয়ে পড়েছিল। বেসামরিক কিছু স্বেচ্ছাসেবকের তত্ত্বাবধানে তাদের টাটকা খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

আমার নিজের জন্য সামান্য সময় দরকার ছিল। নিজাম আমাকে যা বলেছেন, তার একটি জবাব তাকে দেওয়াটা ছিল জরুরি। কিন্তু তার সঙ্গে যোগাযোগের সময়ই বের করতে পারছিলাম না। অন্যদিকে জানতে পারলাম যে, মুসতাক

https://nagorikpathagar.org

আহমেদের কাছ থেকে প্রাপ্ত কিছু গোপন সংবাদ ডিকোড করা হয়েছে, যা আমার জন্য অপেক্ষমাণ অবস্থায় আছে। শাহ মঞ্জিলে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যেখানে ডিকোডেড সংবাদ আমার জন্য রাখা ছিল। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম যে, নিজাম আমাকে তিনবার ফোন করেছিলেন। নিজাম আমাকে খুব জরুরিভাবে দেখা করতে বলেছেন। মুসতাক আহমেদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ম্যাসেজটির ওপর একবার চোখ বুলিয়েই আমি নিজামের সঙ্গে দেখা করার জন্য রওনা দিলাম। ভাবছিলাম আমাকে বলার তার আর কীই-বা বাকি আছে।

সত্যিই তার আমাকে বলার তেমন কিছু ছিল না এবং তার জবাবে আমারও বলার তেমন কিছুই ছিল না। আমাদের আলাপ-আলোচনার মাঝে দুবার আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে তথ্য আসে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আমাদের কথা বলার মাঝে কয়েকটি বিমান বেশ নিচ দিয়ে উড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। বিমানগুলো ভারতীয় বাহিনীর নাকি আমাদের সরবরাহকারী বিমান বুঝতে পারছিলাম না। এরপর শুনতে পেলাম নিজামকে রক্ষাকারী বাহিনীর ব্রেনগানের আওয়াজ। নিজেদের বিমানের দিকেই আবার গুলি চালানো হচ্ছে কি না, ভেবে অস্বস্তি অনুভব করছিলাম।

নিজামের সঙ্গে বক্তব্য সেরে আমি আর্মি হেডকোয়ার্টারের দিকে রওনা হলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, নিজাম বিকালে আলোচিত বিষয়টি নিয়ে আমার মতামত চাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি কৌশলে সেই বিষয়টি এড়িয়ে সেখান থেকে বিদায় হলাম। নিরাপত্তা পরিষদের মতামত তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানাব, এ কথা দিলাম।

নিজামের সঙ্গে এমন ব্যবহার আগে কখনো আমার দ্বারা হয়নি। নিজের কাছে খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু ওই বিষয় নিয়ে আলাপ করে আবেগময় হয়ে ওঠার সময় আমার হাতে ছিল না মোটেই। আর্মি হেডকোয়ার্টারে এসে দেখলাম, সেটা আর আর্মি অফিসারদের জমায়েতস্থল হিসেবে টিকে নেই। সেনাপ্রধান বা অন্য কোনো সামরিক কর্মকর্তাই নেই। সেখানে ছিল শুধু কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসামরিক ব্যক্তি, যারা বিভিন্ন সরবরাহের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত ছিল এবং পূর্বে আলোচিত বিষয়গুলো নিয়েই আবারও আলোচনা করছিল। কাসেম রিজভী ব্যস্ত ছিল তার রাজাকার সদস্যদের ঠিকমতো ঠিক গন্তব্যে পৌঁছানো নিয়ে। এবং একটু পরপর আমার অভিমত নিচ্ছিলেন। তিনি সামরিক অবস্থা নিয়ে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। কিন্তু তাকে মোটেও ভীত দেখাচ্ছিল না। আত্মবিশ্বাস নিয়েই তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন।

https://nagorikpathagar.org

পরাজয়, আত্মসমর্পণ এবং ভারত কর্তৃক হায়দারাবাদ দখলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাক্ষীদের একজন স্যার মীর লায়েক আলি। তিনি ছিলেন নিজামের পরেই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। দেশের প্রধানমন্ত্রী। হায়দারাবাদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং অসহায় সাক্ষী। সাক্ষী হিসেবে কাশেম রিজভীও ছিলেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ আরেকজন। কারণ, তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই হায়দারাবাদের জনগণের নেতা। কিন্তু তিনি তার সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে যাওয়ার সুযোগ পাননি। কারণ, ভারত কর্তৃক হায়দারাবাদ দখলের পর নির্মম নির্যাতনের শিকার হন কাশেম রিজভী। মাতৃভূমি হায়দারাবাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্য যিনি নিজের সর্বস্ব উজাড় করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেছেন, সেই কাশেম রিজভীর বিচার হয় দেশদ্রোহিতার অপরাধে। জীবনের দীর্ঘ সময় তাকে কাটাতে হয় ভারতীয়দের কারাপ্রকোষ্ঠে। তার কারাবরণ ও মৃত্যুর ভেতর দিয়েই চিরতরে নিভে যায় হায়দারাবাদের প্রাণের প্রদীপ। উপসংহারে অন্য কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে সেজন্য লায়েক আলির বর্ণনাকেই হুবহু তুলে ধরছি :

মাঝরাতের দিকে পশ্চিমে দায়িত্ব পালনরত ব্রিগেডিয়ারকে সেনাবাহিনী প্রধানের রুমে প্রবেশ করতে দেখা গেল। তিনি জানালেন, ভারতীয় বাহিনী রাতেই কিছু সময় আগে জহিরাবাদ পার হয়ে হায়দারাবাদের দিকে এগিয়ে আসছে। টুয়েন্টি-ফাইভ পাউন্ডের কামানের সীমায় প্রবেশ করতেই আমাদের বাহিনী তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং চারটি ভারতীয় সেরমান ট্যাংক ওই হামলায় বিস্ফোরিত হয়। এতে ভারতীয় বাহিনী আবার জহিরাবাদের দিকে পশ্চাদপসরণ করেছে। তিনি মনে করেন, সকালের মধ্যে ভারতীয় বাহিনী আবার সেখানে উপস্থিত হবে। সে কারণে তিনি ঘটনাবলি তুলে ধরার জন্য নিজেই চলে এসেছেন। তিনি বললেন, তিনি জানতে চান এখন তিনি কী করবেন। তাকে দেখে খুব বিচলিত মনে হচ্ছিল। তিনি চলে যাওয়ার পরপরই সেনাপ্রধান তার সম্পর্কে নিজের মতামত দিলেন। বললেন, তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি খুব ভীত ও বিচলিত। এ অবস্থায় তিনি তার দায়িত্বপালনে অনুপযুক্ত। সেনাপ্রধান হেডকোয়ার্টার থেকে

https://nagorikpathagar.org

অন্য একজন ব্রিগেডিয়ারকে তার পরিবর্তে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য পাঠাতে মত দিলেন। নতুন ব্রিগেডিয়ারকে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হলো। তিনি রওনা হওয়ার আগে আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, যে করেই হোক ভারতীয় বাহিনীকে এগোতে দেওয়া যাবে না। তাকে আরও বললাম, হায়দারাবাদের ভাগ্য এখন তার হাতে। তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন, তিনি তার সব সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করবেন।

পশ্চিম আবারও যুদ্ধের ময়দানের অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে পরিণত হলো। পূর্বে ভারতীয় বাহিনীর অগ্রসরের নতুন কোনো খবর পাওয়া গেল না। পশ্চিমে নতুন একজনকে দায়িত্ব দিয়ে আমার স্বস্তি হচ্ছিল না। তাই আমি সেনাপ্রধানকে বললাম, যেন তিনি নিজে সেখানে চলে যান। সবকিছু ঠিকঠাকমতো চলছে কি না, সেদিকে খেয়াল রাখেন। তিনি চলে গেলেন। তার স্থানে একজন সিনিয়র স্টাফ দায়িত্ব তুলে নিলেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত নতুন এই কর্মকর্তা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং দ্রুত কর্মসম্পাদন করতে লাগলেন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমে মাইন পুঁতে রাখার দিকে জোর দিলেন। সামরিক ও অসামরিক বাহিনীর লোকদের দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন মাইন পুঁতে রাখার জন্য।

তখন ভোর ৪টা বাজে। ১৭ সেপ্টেম্বর। দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ আমাকে অনুরোধ করলেন বাড়ি ফিরে কিছু বিশ্রাম গ্রহণের জন্য। আমি দুই রাতের মধ্যে বিশ্রামের তেমন কোনো সুযোগ পাইনি। শেষ পর্যন্ত আমি বিশ্রামের লক্ষ্যে আর্মি হেডকোয়ার্টার ছেড়ে রওনা দিলাম। বাড়ি ফেরার পথে শাহ মনজিলে একবার দেখা দিলাম। চলে গেলাম সেখানে, যেখানে গোপন তথ্য ডিকোড করা হচ্ছিল। জানতে পারলাম, মুসতাক আহমেদ নিরাপত্তা পরিষদ-বিষয়ক নতুন কোনো তথ্য পাঠাননি। বাড়ি পৌঁছে আমি বিশ্রাম নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। তখনই আমাকে জানানো হলো যে, রেলওয়ের চিফ ফোনে হোল্ডে আছেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি আমাকে জানালেন, বিবিনগরে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টেশনমাস্টার তাকে জানিয়েছেন, সেখানে গোলাগুলি হচ্ছে এবং ভারতীয় বাহিনী রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে বিবিনগর-হায়দারাবাদ রোড দিয়ে। 'কি! এটা কীভাবে হতে পারে? বিবিনগর রেলওয়ের কাছে গোলাগুলি হচ্ছে! ভারতীয় বাহিনী কী করে বিবিনগর পৌঁছল?' কীভাবে হয়েছে, তার উত্তর তিনি দিতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনি বললেন, বিবিনগর দিয়েই ভারতীয় বাহিনী আসছে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। বিবিনগর থেকে রাজধানীর দূরত্ব মাত্র ত্রিশ মাইলের মতো। সেই পথে প্রায় নিরাপত্তাব্যবস্থা নেই বললেই চলে! এটাই ছিল তখন পর্যন্ত আমার শোনা সবচেয়ে ভীতিকর তথ্য। তার মানে শুধু এই হতে পারে যে, হয় ভারতীয় বাহিনী নাকরাকালে অবস্থিত

https://nagorikpathagar.org

সব প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অথবা তাদের কোনোভাবে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসছে। পূর্বেও তারা দিলামকে পাশ কাটিয়ে হঠাৎ বিদরে উপস্থিত হয়েছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে আর্মি হেডকোয়ার্টারে ফোন করলাম। আমাকে জানানো হলো, সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পূর্বে নতুন কোনো কিছু ঘটেনি। আমাদের সেনাবাহিনী ঠিকমতোই আছে এখন পর্যন্ত, যদিও তাদের ওপর ভারতীয় বিমানবাহিনী খানিক সময় পরপর বোমা নিক্ষেপ করছে। আমি যা জানতে পেরেছি তা তাদের জানালাম এবং উত্তরে জানলাম—তারাও একটু আগেই একই উৎস থেকে সেই খবর পেয়েছে। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। তাদের কি থামানোর কোনোই উপায় নেই? হিসাব করে দেখা গেল, ভারতীয় বাহিনীর রাজধানী পৌঁছতে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টার মতো সময় লাগবে। তাদের আক্রমণ ঠেকানোর কোনো ব্যবস্থা সেখানে নেই। আবার সেখানে সৈন্য পাঠানোর কোনো ব্যবস্থাও নেই।

আমার কাছে তখন মনে হচ্ছিল, এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল। বিবিনগর থেকে সোজা অরক্ষিত পথে তারা রাজধানী পৌঁছে যাবে এবং এখন তাদের থামানোর জন্য করারও কিছু নেই। আমি হাতে-মুখে পানি নিয়ে ফজরের নামাজ পড়ে কুরআন থেকে কিছু আয়াত পাঠ করে পোশাক পরিধান করে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। তখন খবর পেলাম, সেনাবাহিনী প্রধান এসে পৌঁছে গেছেন। আর্মি কমান্ডারের জন্য কফি পাঠানোর নির্দেশ দিলাম। জানতে পারলাম, তিনি পশ্চিমে যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করে সোজা আমার বাসভবনে চলে এসেছেন। তাকে দেখে দৃশ্যত খুব ক্লান্ত ও ভীত মনে হচ্ছিল। তিনি জানালেন, আমার কথামতো তিনি পরিদর্শন করে দেখেছেন। জানতে পেরেছেন, সেখানকার সৈন্যরা ক্লান্ত এবং তাদের মধ্যে তেমন কোনো শৃঙ্খলা নেই। সবকিছু বিবেচনা করে তিনি বললেন, ওই স্থানে কোনো হামলা হলে তারা সামাল দিতে পারবে না। তিনি আরও জানালেন, দিনের শেষে ভারতীয় বাহিনী এখানে পৌঁছে যাবে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের ফুরিয়ে গেছে। সুতরাং যেটাই হোক, রাজনৈতিক কোনো সমঝোতায় আসতে হবে।

আমি স্থিরচিত্তে তার কথা শুনলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, পূর্ব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোনো সংবাদ তার কাছে আছে কি না এবং তিনি 'না' জবাব দিলেন। তাকে জানালাম রেলওয়ে চিফের কথা। তিনি শুনে আশ্চর্য হলেন এবং সমাধানে এলেন যে, ভারতীয় বাহিনী নিশ্চয়ই কোনোভাবে নাকরাকালে অবস্থিত বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসছে। তিনি জানালেন, যদি তা-ই হয়, তবে দুপুরের মধ্যে ভারতীয় বাহিনী রাজধানীতে এসে উপস্থিত হবে। তারপর কী হবে

https://nagorikpathagar.org

তা চিন্তা করাও ভয়ের। আমি শাহ্ মনজিলে আমার ব্যক্তিগত অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। জানতে পারলাম মুসতাক আহমেদ গোপন তথ্য পাঠিয়েছেন। তথ্য অবশ্যই প্যারিসে কী চলছে, তা নিয়েই হবে।

নিরাপত্তা পরিষদের দীর্ঘ প্রত্যাশিত বৈঠক শেষ পর্যন্ত ১৬ সেপ্টেম্বর বিকালে বসে। বৈঠকটি ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার আলেকজান্ডার কাডোগানের সভাপতিত্বে আয়োজিত হয়। বৈঠকে প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে, হায়দারাবাদের বিষয়টি বৈঠকে আলোচিত হবে কি না। এটি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্ত। কারণ, কিছু টেকনিক্যাল কারণে বিষয়টি বাতিলও হতে পারত। চীনের প্রতিনিধি জিয়াং, যিনি পরিষদের একজন স্থায়ী সদস্য, তিনি প্রস্তাব রাখলেন বিষয়টি নিয়ে আলোচনার তারিখ পিছিয়ে ২০ সেপ্টেম্বর রাখার জন্য। তিনি জানালেন, এ বিষয়ে কোনো মতামত তার সরকার এখনও তাকে দেয়নি। স্যার আলেকজান্ডার কাডোগান তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন। বললেন, এটি একটি জরুরি বিষয়। সেহেতু এ বিষয় নিয়ে আমরা এগোব কি না, তা নিয়ে অন্তত পক্ষে সময় অপচয় করা উচিত নয়। ফ্রান্সের প্রতিনিধি পারোদি সভাপতির সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করলেন। বেলজিয়াম দাবি করল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা এক দিন পেছানোর জন্য। জনাব মালিক (ইউএসএসআর) সভাপতির কাছ থেকে ১৯৪৭-এর ভারত স্বাধীনতা আইনের আলোকে হায়দারাবাদ-বিষয়ক তথ্য এবং সে বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার অনুরোধ করলেন। যেহেতু তিনি যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি, তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যত সম্ভব তিনি তথ্য দিয়ে সাহায্য করবেন যখন উপযুক্ত সময় হবে। জেসোপ (ইউএসএ) বললেন, তিনি বিষয়টি পরিষদে আলোচনায় আনার পক্ষে। জনাব আরস (আর্জেন্টিনা) তার সঙ্গে শক্তভাবে একমত হলেন। বললেন, যখন একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ চালায় এবং সেখানে নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করে, তখন জাতিসংঘ তাদের নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে চলতে পারে না। কিন্তু আলাপ-আলোচনার পর চীনের প্রস্তাবের ওপর ভোট গ্রহণ করা হলো এবং যেহেতু চীন বাদে কেউ তাতে সমর্থন করছিল না। অতএব, বাতিল হয়ে গেল।

এবার হায়দারাবাদের বিষয়টি নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা হবে কি না, সে বিষয়ে ভোট হলো। আলোচনার পক্ষে ৮টি এবং বাতিলের পক্ষে ৩টি ভোট পড়ল। এরপর হায়দারাবাদের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচিত বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা পেল। সভাপতি আমন্ত্রণ জানালেন হায়দারাবাদের প্রতিনিধি মঈন নওয়াজ জংকে তার কেস তুলে ধরার জন্য। মঈন নওয়াজ জং জোরদারভাবে তার বক্তব্য পেশ করলেন। তার বক্তব্যে তিনি বললেন, যাতে নিরাপত্তা পরিষদ সেখানে হস্তক্ষেপ করে এবং রক্তক্ষয় থামিয়ে তার দেশকে

https://nagorikpathagar.org

ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। কাজটি এমনভাবে সম্পাদন করে যেন তা হয় স্থায়ী। এবার এলো ভারতের পক্ষে বলার জন্য রামসোয়ামি সুহলির পালা। আক্রমণকারী পক্ষ হিসেবে তার আসলে বলার তেমন কিছুই ছিল না। তিনি নিরাপত্তা পরিষদে হায়দারাবাদের কেস উপস্থাপনের বিষয়টি নিয়েই টানাটানি করলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন—তিনি প্রমাণ উপস্থাপন করবেন যে, হায়দারাবাদ কখনোই আসলে স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না।

দু-পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সভাপতি বৈঠক গুটিয়ে নিলেন। সব সদস্যকে বিষয়টি নিয়ে ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য আদেশ করে দ্বিতীয় বৈঠকে বসার দিন ঠিক করলেন ২০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। তাদের মতামত উপস্থাপনের জন্য বললেন সেই দিন। এই একটি সিদ্ধান্ত হায়দারাবাদকে শেষ করে দিলো।

নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যদিও সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল, বিষয়টি সমাধানের তারিখ ২০ সেপ্টেম্বরে পিছিয়ে দেওয়া একটি তমসাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করল। হায়দারাবাদের কর্তৃপক্ষ জানত যে, ২০ সেপ্টেম্বর বেশি দেরি হয়ে যায়। সেই লক্ষ্যে তারা সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করল, প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে বৈঠকটি এগিয়ে আনার অনুরোধ করল। স্যার আলেকজান্ডার কাডোগান বললেন, চাইলেও এটা শনিবার ১৮ সেপ্টেম্বরে আনা সম্ভব হবে না। অস্ত্র সংবরণের প্রস্তাব নিয়ে সব প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করা হলো এবং চীন বাদে বাকি সব সদস্য তার পক্ষে মত দিলো। যদিও রাশিয়ার এ বিষয়ে কোনো কিছু বলার ছিল না। পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে মোড় নেবে, শুধু যদি হায়দারাবাদ ভারতকে সেই সময় পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই সময় পর্যন্ত ভারতীয় আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা হায়দারাবাদ সেনাবাহিনীর ছিল না!

সবকিছু বিবেচনায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের তাৎপর্য এই মুহূর্তে তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে অক্ষম। অন্যদিকে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে, রাজধানীর ৩০ মাইলের মধ্যে ভারতীয় বাহিনী প্রবেশ করে ফেলেছে। আক্রমণের নির্দেশে তারা যদি রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসে, তবে সাধারণ জনগণের রক্তক্ষয়ের বন্যায় দেশের মাটি প্লাবিত হবে। ভারতীয় বাহিনীর গণহত্যার প্রবণতা আগেই বোঝা গেছে—যখন তারা ওসমানাবাদ, কালিয়ানি, বিদর এবং আরও অনেক শহরের নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিচারে হত্যা করেছিল। তাদের মূল ক্ষোভ ছিল ওইসব এলাকার মুসলিম জনবসতির প্রতি। এরই মধ্যে শহরগুলোতে যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, তবে হতাহতের মাত্রা কোথায় গিয়ে উঠবে, তা চিন্তা করাও কষ্টকর। আমি আর সময় অপচয় করতে পারব না। হয়তো-বা নিজাম

https://nagorikpathagar.org

পারবেন ধ্বংসযজ্ঞ থামাতে। আমি ঠিক করে ফেললাম, আমি পদত্যাগ করব এবং আমার মন্ত্রিসভার সদস্যদেরও পদত্যাগ করার জন্য মতামত দিলাম।

সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে কাজ শেষে আমি শাহ্ মনজিলে চলে গেলাম। সেখানে মুসতাক আহমেদের আরও কিছু গোপন তথ্য ডিকোড করা হচ্ছিল। তার মধ্যে একটি ম্যাসেজে তিনি পাকিস্তানি নেতাদের পক্ষ থেকে জানিয়েছেন যে, তারা চায় আমি যেন দ্রুত হায়দারাবাদ ত্যাগ করি, যাতে ভারতীয় বাহিনী আমাকে পাকড়াও করতে সক্ষম না হয়। সেখানে প্যারিসের নিরাপত্তা পরিষদ-বিষয়ক আরও কিছু তথ্য ছিল। আমি সেদিন সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে মন্ত্রিসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকলাম। কাসেম রিজভী আমার পরিস্থিতি জানার জন্য ফোনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। আমি তাকে জানালাম, পরিস্থিতি এখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করে টিকে থাকাই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। আমি তাকে স্থিরচিত্তে সবকিছু মোকাবিলার উপদেশ দিলাম এবং সাম্প্রদায়িক কোনো দাঙ্গা বা এরূপ কিছু এড়িয়ে চলার জন্য বললাম। তিনি আমাকে জানালেন, যুদ্ধ শুরু থেকেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হওয়ার কোনো ধরনের আলামত পাওয়া যায়নি। এমনটি ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, এই বিপদের ভাগিদার হিন্দু ও মুসলিম উভয়ই। আমি তার সঙ্গে একমত পোষণ করলাম। তাকে জানালাম, এখনই সময় ভেদাভেদ ভুলে সাম্প্রদায়িক একতাকে বড়ো করে দেখার।

সকাল ৮টার দিকে নিজামের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হলো। তারও কিছুক্ষণ আগে তিনি আর্মি কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। আমি তাকে প্যারিসে কী হচ্ছে তা খুলে বললাম। নিরাপত্তা পরিষদ এখন কীই-বা করবে, যেহেতু তারা গোলাগুলি বন্ধ করার বিষয়ে একটি প্রস্তাবও পাস করাতে পারেনি। আলোচনা করে কী-বা লাভ হবে? বললেন নিজাম। এত লোক মারা গেল, এত রক্তক্ষয় হলো, এখন কাদের পক্ষে তারা রায় দিতে চাচ্ছে? আর কিছু সময়ের মধ্যেই ভারতীয় বাহিনী তাদের অস্ত্রহাতে হাজির হবে, আর কতক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে? আমি কি বুঝছি না যে, যুদ্ধরত অবস্থায় ভারতীয় বাহিনী যদি রাজধানীতে প্রবেশ করে, তবে কী পরিমাণ হতাহতের খবর আসবে, কী পরিমাণ রক্তক্ষয় ঘটবে! সেসব হতভাগ্যের কথা কি আমি জানি না, পূর্বে যাদের শহরে ভারতীয় বাহিনী হানা দিয়েছিল? আমি উত্তরে নিজামকে বললাম, হ্যাঁ, আমি জানি। যতটুকু দরকার আমি ততটুকু জানি এবং আমি তার চেয়েও বেশি জানি। কিন্তু এত মৃত্যু সত্ত্বেও স্বাধীনতাই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আমি নিজামকে জানালাম, তিনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলছেন, আমি তা বুঝি এবং আমি তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াব না। আমি জানালাম যে, সকালেই আমি আমার পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার

https://nagorikpathagar.org

সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং মন্ত্রিসভার সবাইকেও একই উপদেশ দিয়েছি। এখন পর্যন্ত যা বুঝছি, তারা সবাই আমার কথা মান্য করবে।

মন্ত্রিসভার সব মন্ত্রী এবং সিনিয়র সেক্রেটারিরা সবাই শাহ মনজিলে একত্রিত হয়েছিলেন। অধীর আগ্রহে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি পৌঁছেই তাদের সঙ্গে একত্রে সব কাজ শুরু করে দিলাম। সব ঘটনা তাদের খুলে বললাম। বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরলাম। নিজামের মতামত তাদের জানালাম। এও জানালাম যে, নিজাম চান হয় সব দায়িত্ব তার নিজের হাতে তুলে নেবেন অথবা সব দায়িত্ব পরিহার করবেন এবং সেই মর্মে ঘোষণা দেবেন। আমি সবাইকে বললাম, তারা পরিস্থিতি যেন খুব ভালো করে বিবেচনা করে দেখে। এরপর তাদের মতামত স্পষ্টভাবে নির্ভয়ে প্রত্যেকে যেন আমাকে জানায়। কিছু সময়ের জন্য রুমটি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। উপ-প্রধানমন্ত্রী পিঙ্গেল রাধা রেড্ডী প্রথম নিস্তব্ধতাকে ভাঙলেন। তিনি স্পষ্টভাবে বললেন, তিনি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের খাতিরে নিজের জান দিতেও প্রস্তুত। তিনি বললেন, নিজাম যদি মনে করেন যে, কোনোভাবে তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন, তবে তিনি বাধ্য সেই উপদেশ মেনে নিতে। এরপর তিনি তার পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করবেন। তিনি আরও বললেন, আমার দায়িত্বাধীন অবস্থায় সব সরকারি কর্মকর্তা এবং নাগরিক তাদের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা দিয়ে দেশরক্ষার স্বার্থে কাজ করেছে এবং নিজেদের কখনোই দুর্বল মনে করেনি। তিনি আরও বললেন, যদিও একা যুদ্ধ করে বিশাল ভারতীয় শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়েছে, আমরা প্রত্যেকে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত দেশপ্রেমের জন্য যা করেছি, সবই ছিল সঠিক। এখানে অনুতাপের কিছুই নেই। তিনি বললেন, হয়তো-বা এটাই তার শেষ বক্তব্য। হয়তো কিছু সময়ের মধ্যেই তাকে গুলি করে মারা হবে। কিন্তু সেই মৃত্যু কোনোভাবেই সম্মানহীন মৃত্যু নয়। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, যদি আমি পদত্যাগ করি, তিনিও ধারাবাহিকভাবে পদত্যাগ করবেন।

তার বক্তব্য ছোটো হলেও খুব তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরাও সংক্ষেপে একই রকম বক্তব্য পেশ করলেন। নিজামের কাছে পেশ করার উদ্দেশ্যে একটি লিখিত দলিল তৈরি করা হলো, যেখানে বলা হলো যে মন্ত্রিসভার সবাই তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে দেশ রক্ষার্থে। কিন্তু ভারতীয় পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। তাই আত্মসমর্পণের পথ বেছে নেওয়া হলো এবং এই মর্মে প্রত্যেকে পদত্যাগপত্র নিজামের কাছে জমা দিচ্ছি। আমার তত্ত্বাবধানে পত্রটি নিজামের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়েই দেখলাম, কিছু স্টাফ অফিসার আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তারা আমাকে জানালেন যে, ভারতীয় বাহিনীর গন্তব্য বের করার

https://nagorikpathagar.org

উদ্দেশ্যে যারা যাত্রা করেছিল, তারা বিবিনগর এবং তা পেরিয়ে আরও দূর পর্যন্ত খুঁজেও ভারতীয় বাহিনীর কোনো অস্তিত্ব পায়নি। দেখা যাচ্ছে, রেলওয়ে থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা ছিল মিথ্যা। তারা এও জানাল যে, শুধু বিমান থেকে অনবরত বোমা নিক্ষেপণ ছাড়া পূর্ব-পশ্চিম যুদ্ধক্ষেত্রেও ভারতীয় বাহিনীর কোনো অগ্রসরতা লক্ষ করা যাচ্ছে না। তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু পড়তে লাগল। আমি তাদের জানালাম যে, সরকার পদত্যাগ করেছে এবং নিজাম কিছু সময়ের মধ্যেই শান্তির বাণী পেশ করবেন। 'কিন্তু কেন স্যার'—তারা বলে উঠল—'আমরা এখন পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম। তাদের আক্রমণ আরও কিছু সময় আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারব।' 'সাব্বাস'—আমি তাদের বললাম—'হয়তো-বা আমরা শিগ্‌গির মারা যাব, কিন্তু আমাদের বিজয়ী চেতনা চিরকাল বেঁচে থাকবে।'

নিজামের কাছ থেকে একটি জরুরি ফরমায়েশ এলো এবং আমাকে দ্রুত দেখা করতে বলা হলো। আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম, দেখলাম নিজাম পুলিশপ্রধান এবং সেনাবাহিনী প্রধানকে নিয়ে আলোচনা করছেন একটি নতুন সরকার গড়ার বিষয়ে। তিনি ততক্ষণে মুন্সীর কাছে খবরটি পাঠিয়ে দিয়েছেন যে, আমার সরকার পদত্যাগ করেছে এবং নতুন সরকার গড়ার জন্য তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের পরামর্শ চান। আমি এই বিষয়ক আলোচনাতে অংশগ্রহণ করিনি। আমি বৈঠক শেষে নিজামের সঙ্গে দেখা করলাম। মত দিলাম—এটা আশা করা উচিত নয় যে, এত সহজভাবে সব হয়ে যাবে। আরও উপদেশ দিলাম, অফিসে রক্ষিত গোপনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল ধ্বংস করে ফেলতে। তিনি আমার মত নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবলেন এবং তারপর তার পার্সোনাল সেক্রেটারিকে আদেশ দিলেন অফিস থেকে সব গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং ফাইল বের করে ধ্বংস করে ফেলতে।

আমি শাহ মনজিলে ফিরে গেলাম এবং সেখানে সব গোপনীয় দলিল, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং বিশেষ করে গোপন তথ্য ডিকোড করার যে কি-গুলো ছিল, সবই ধ্বংস করে ফেলার আদেশ দিলাম। এরপর মুসতাক আহমেদের কাছে একটি ম্যাসেজ পাঠালাম। এটিই ছিল তার কাছে পাঠানো শেষ ম্যাসেজ। ম্যাসেজে তাকে জানালাম, ভারতের সামরিক শক্তির কাছে আমরা পরাজিত এবং নিজামের নির্দেশে আত্মসমর্পণ করেছি। এটিই হয়তো আমার শেষ ম্যাসেজ। হয়তো-বা কিছু সময়ের মধ্যেই আমরা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করব। তাকে এও বললাম—আমরা যদি নাও থাকি, তিনি যেন আমাদের পতাকা ওড়াতেই থাকেন। সর্বশক্তি দিয়ে যেন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তিনি তার যুদ্ধ চালিয়ে যান।

https://nagorikpathagar.org

নিজামের কাছ থেকে ফেরার সময় আমি মুন্সীকে কল দিয়েছিলাম। তিনি ভারতের সঙ্গে ফের টেলিফোন, বেতার ও টেলিগ্রাফের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। আমি জেনে অবাক হয়েছিলাম, নিজামের মতোই তিনিও আবার সরকার গঠনের বিষয়টি নিয়ে তার স্টাফদের সঙ্গে ব্যস্ত ছিলেন। এমন একটি সরকার, যার প্রধান উপদেষ্টা হবেন তিনি। আমি মুন্সীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম—সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের অনেক মিথ্যা প্রচার থাকলেও বাস্তবে কোথাও হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে কোনো ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা হায়দারাবাদে ঘটেনি। আমি তার কাছে আশা রেখে অনুরোধ করেছিলাম আগত আর্মি কমান্ডারদের ভালো কাজে লাগাতে; যেমনটি পূর্ববর্তী শহরগুলোতে করেছে, সেখানে যেমন গণহত্যা চালানো হয়েছে, তা যেন এখানে না করে। আমার কথা তার মর্মকে স্পর্শ করেছিল বলে মনে হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন যেন দখলদার বাহিনী সাধারণ জনগণের ওপর কোনো হত্যাযজ্ঞ না চালায়।

নিজামের একটি টেলিফোন কলে রাখা অনুরোধের কারণে আমি তার সঙ্গে একত্রে শুক্রবারের নামাজ আদায়ের জন্য গণ-উদ্যানে অবস্থিত সুন্দর ছোটো মসজিদটিতে হাজির হলাম। নামাজ শেষে নিজাম আমার কাছে কিছু সময় চেয়ে নিলেন। আমি রাজি হলাম। পরে আমি সেখান থেকে শাহ মনজিলে চলে আসি, সেখানে সব গোপন নথিপত্র ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে কি না, তা তদারকি করে দেখার জন্য।

সেদিন বিকালের দিকে আমি একবার হায়দারাবাদ রেডিও স্টেশনে গেলাম হায়দারাবাদের জনগণের উদ্দেশে একটি ম্যাসেজ বেতারে ঘোষণার জন্য। খুবই সংক্ষেপে আমার বক্তব্যে আমি বললাম, হায়দারাবাদের এখন ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং তার সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। স্বাধীনতা রক্ষায় সফল না হওয়ায় সরকার পদত্যাগ করেছে। আমি আরও বললাম, এই বিপদে প্রত্যেক নারী-পুরুষ এবং শিশু যেন সাহস না হারায়, ধৈর্যচ্যুত না হয়। আমি তাদের উপদেশ দিলাম এক নতুন শাসনব্যবস্থার জন্য নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে। এমন এক শাসনব্যবস্থার জন্য, যার সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারার কোনো মিল নেই। আমি তাদের বিশেষভাবে নজর দিতে বললাম—যেন কোথাও একটি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষও না হয়; আমরা সব সময় মিলেমিশে যেভাবে চলেছি, তা ভুলে যেন নিজের জাতকে এমন অমঙ্গলজনক কাজে রক্তাক্ত না করি। আমি তাদের বললাম, খোদার ওপর বিশ্বাস রাখতে এবং তাদের তাঁরই হাতে ছেড়ে দিলাম।

https://nagorikpathagar.org

ফেরার পথে আমি লক্ষ করলাম, দোকানে-বাজারে যেখানেই রেডিও আছে সবগুলোরই ভলিউম বাড়ানো। সেখানে মানুষ ভিড় জমিয়েছে। সবাই আমার বক্তব্য শুনেছে। তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল সমগ্র হায়দারাবাদ যেন গুমরে-গুমরে কাঁদছে। দেখে মনে হচ্ছিল, সবাই কেমন যেন এক-একটি ছোটো পাথরের মতো হয়ে গেছে। দৃশ্যটি দেখে নিজের অজান্তেই আমার চোখ দিয়ে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমি শাহ মনজিলের পথে রওনা দেবার সময় কাসেম রিজভীকে টেলিফোনে একটি দায়িত্ব দিলাম। তাকে বললাম যেন রেডিওতে তিনি জনগণের উদ্দেশে বলেন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার জন্য, শান্তি বজায় রাখার জন্য। প্রথমে যদিও তাকে অনিচ্ছুক দেখাচ্ছিল, পরে তিনি এমন এক ভাষণ দেন, যা ছিল চিত্তাকর্ষক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভাষণে তিনি সবার উদ্দেশে বলেন, কেউ যেন শান্তি-শৃঙ্খলা ও আইন ভঙ্গ না করে এবং সাম্প্রদায়িক গোলযোগে না জড়ায়।

আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত যেসব গোলাবারুদ এবং অস্ত্র ছিল, তা ধ্বংস করে ফেলা ছিল আমার জন্য একটি চিন্তার বিষয়। আমি ক্ষমতা ছাড়ার আগে সাধারণভাবেই একটি আদেশ দিয়েছিলাম এ বিষয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আমি ক্ষমতায় না থাকা সত্ত্বেও আমার আদেশ সব কর্মচারী ঠিকমতোই পালন করল। তখন একটি ছোটো ঘটনা আমার মর্মকে স্পর্শ করেছিল। আবদুর রহিম নামে মন্ত্রিসভার এক সদস্য আমার কাছে ছুটে এসে করুণভাবে একটি আবদার রেখেছিলেন। বলেছিলেন যেন কোনোভাবে কাসেম রিজভীকে আমি পাকিস্তান বা অন্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। তিনি বলেছিলেন, আমি জানি কিছু সময়ের মধ্যেই ভারতীয় বাহিনী এখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের সবাইকে গুলি করে মারবে। কিন্তু তারা কাসেম রিজভীকে কেটে টুকরো টুকরো করে মারবে। তার দেহাবশেষ শকুনকে ভক্ষণের জন্য দেবে। আমি তার পরার্থপরতা এবং আন্তরিকতা দেখে আন্দোলিত হয়েছিলাম। আমি আর্মি চিফকে ফোন করি এবং তাকে জিজ্ঞাসা করি, কাসেম রিজভীকে কোনোভাবে বিমানে করে পাঠিয়ে দেওয়া যায় কি না। কিন্তু দুঃখজনক! তিনি বলেন, এটা এখন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, ভারতীয় বিমান সর্বত্র পাহারা দিচ্ছে এবং আমাদের বিমান উড়তে দেখলেই তাকে ভূপাতিত করবে।

এরপর আমি ঠিক করলাম নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কমিয়ে আনব। কিন্তু কাজ হলো না। দেখা গেল, নিজাম নিজেই বারবার আমাকে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ডাকছেন। এমনই এক সাক্ষাৎকারে আমি উপস্থিত। উপস্থিত হয়ে লক্ষ করলাম—আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব অর্থাৎ তরবারি কে তুলে দেবে বিপক্ষের আর্মি কমান্ডারের হাতে, তা নিয়ে আলোচনা চলছিল। আর্মিপ্রধান মনে

https://nagorikpathagar.org

করছিলেন, এই কাজের জন্য তিনিই হলেন সঠিক ব্যক্তি। কিন্তু বৈঠকে উপস্থিত অন্যদের মধ্যে অনেকেই মনে করছিলেন—এই দায়িত্ব বহন করা উচিত বিদরের রাজকুমারের, যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কমান্ডার-ইন-চিফ ছিলেন। নিজাম এ ব্যাপারে এতটাই দুঃখিত ছিলেন যে, তিনি এ বিষয়ে আমার মতামতটুকুও চাইলেন না।

সেদিন সন্ধ্যাতেই মুন্সী একটি কূটনৈতিক ও বুদ্ধিমান চাল চাললেন। তিনি নিজামকে বাধ্য করেন রেডিওতে নিরাপত্তা পরিষদকে উদ্দেশ করে এই মর্মে বক্তব্য পেশ করতে যে—এটা তার আদেশ, হায়দারাবাদের প্রতিনিধিবর্গ যেন তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করে। এরপর মুন্সী নিজেই একটি বক্তব্য রেডিওতে প্রদান করে। দুটি বক্তব্য মিলে এমন দাঁড়ায় যে, আগের সব সরকার ছিল বিপথে এবং বিশেষ করে এই শেষ সরকার তাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট। এখন সব ভুল সংশোধনের সময়। এই মর্মে হায়দারাবাদ এখন ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন সরকার গঠন করতে যাচ্ছে।

পরদিন সকালে আমি যখন সুযোগ পাই, নিজামকে জিজ্ঞাসা করি যে পরামর্শ মোতাবেক সব গোপন এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও দলিল ধ্বংস করা হয়েছে কি না। নিজাম আমাকে নিশ্চয়তা দেন, সবই হয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর বিকালে আর্মি কমান্ডার এবং তার স্টাফরা জিপে করে মেজর জেনারেল জয়ন্ত নারায়ণ চৌধুরীকে বলারামের বাসভবনে নিয়ে আসেন। চৌধুরী ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর দায়িত্বে। নিজাম সেখানে তার নিজের পক্ষের লোক পাঠালেন। যাদের মধ্যে ছিল জুলকাদের জং, আবুল হাসান সাঈদ আলি, আলি ইয়াভোর জং এবং আরও এক কি দুজন। তারা সেখানে নিজামের পক্ষ থেকে তাকে শুভেচ্ছা জানায় এবং নিজাম মুন্সীর মতামত গ্রহণে নতুন যে সরকার গঠনের নকশা প্রস্তুত করেছেন, তা পেশ করেন; যেন তা তার গ্রহণযোগ্যতা পায়। বিকালে আবারও নিজামের ডাকে যখন আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাই, আমাদের সাক্ষাতের মাঝে নিজামের পক্ষ থেকে পাঠানো দূতরা ফিরে আসেন। তাদের চেহারা মলিন সবুজ বর্ণ ধারণ করেছিল। তারা জানাল যে, জেনারেল চৌধুরী তাদের সরকার গঠনের প্রস্তাব নাকচ করেছে এবং নিজামের এ বিষয়ক সব মতামত তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন বলে বলেছেন। তারা আরও জানাল, তিনি বলেছেন তিনি মার্শাল ল কায়েম করবেন। সামরিক শাসনে দেশ চলবে এবং তিনি নিজেই শাসনভার হাতে নেবেন।

'কী কী'—নিজাম চিৎকার করে উঠলেন।

এরপর তিনি আমার দিকে ফিরে জোর কণ্ঠে বললেন—'কিন্তু লায়েক আলি, মুন্সীর সঙ্গে তো আমার এমন কথা হয়নি।'

https://nagorikpathagar.org

'আমি বুঝতে পারছি'—জবাব দিলাম আমি।

তিনি আমার কথার কোনো পালটা উত্তর দিলেন না। আমি বুঝতে পারলাম, এই বৈঠকে আমার উপস্থিতি কাম্য নয়। তাই আমি নিজামের অনুমতি চাইলাম সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য। নিজাম আমাকে অনুমতি দিলেন, তবে বললেন যেন পরদিন সকালে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু সেটি আর কখনো হয়ে ওঠেনি।

বাড়ি ফিরে আমি জানতে পারলাম, ভারতীয়রা ১৯ তারিখ দুপুরে পশ্চিম থেকে এবং বিকালে পূর্ব থেকে রাজধানীতে প্রবেশের পরিকল্পনা করেছে। পরে সন্ধ্যায় একজন বার্তাবাহক পুলিশ চিফের কাছ থেকে আমার জন্য একটি চিঠি নিয়ে আসে। এটি ছিল মূলত মিলিটারি গভর্নরের পক্ষ থেকে। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, যেন আমি ঘর থেকে বের না হই, আমি এখন একজন গৃহবন্দি। আমি তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করে দিই, যেন আমার স্ত্রী, বোন ও সন্তানরা নিরাপদে সেখান থেকে দূরে কোনো বন্ধুর বাসায় আশ্রয় নেয়; অন্ততপক্ষে আমার জান নেওয়ার দৃশ্য তাদের যেন প্রত্যক্ষ করতে না হয়। তা ছাড়াও আমার পরিবারবর্গের কাউকে যেন তারা লাঞ্ছিত করতে না পারে, এটাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমার সঙ্গে আর কেউই রইল না। শুধু আমার বাল্যকালের আরবীয় বংশোদ্ভূত একজন শিক্ষক বাদে, যিনি ছোটোবেলা থেকেই আমার দেখভাল করে এসেছেন। পুলিশ চিফের কল এলো। তিনি আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন। তার দ্বারা এমন কাজ করানো হচ্ছে যে, সেজন্য তিনি লজ্জিত। আমি তাকে বললাম, এখানে ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই, আমি ব্যাপারটি বুঝতে পারছি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাসেম রিজভীর কী হবে? তিনি আমাকে জানালেন, পরদিন সকালেই তাকে উঠিয়ে আনা হবে।

কিছুক্ষণ পর কাসেম রিজভীর তরফ থেকে একটি ফোন আসে। তাকে সব সময়ের মতোই প্রফুল্ল শোনাচ্ছিল। তিনি পরদিন সকালে আমার সঙ্গে নাশতা করার অনুমতি চাইলেন, যেমনটা আগেও বহুবার তিনি আমার সঙ্গে করতেন। আমি তাকে কী উত্তর দেবো, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শেষমেশ আমি তাকে জানালাম, আমার বাড়িতে তিনি সব সময়ই স্বাগত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি জানতেন না তার সঙ্গে কী হতে যাচ্ছে।

আমাকে একা রেখে দূরে থাকা আমার পরিবারের জন্য দুরূহ হয়ে পড়েছিল। পরদিন সকালে হঠাৎ তারা বাসায় উপস্থিত হলো। তারাও আমার পরিণতি তাদের নিজেদের জন্য বরণ করে নিয়েছে। কী করে তারা এখানে আবার এসে

https://nagorikpathagar.org

পৌঁছাতে পেরেছে, তা ছিল বড়োই আশ্চর্যের বিষয়। আমার বাসার সব টেলিফোনের লাইন কেটে ফেলা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কী হচ্ছে তা সম্পর্কে আমি মোটামুটি খবর পেতে থাকি। জানতে পারলাম—পূর্ব ও পশ্চিম থেকে সেনাবাহিনীরা প্রবেশ করে বলরাম মিলিটারি স্টেশনের দিকে মার্চ করে আসছে, যেখানে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ ত্যাগের আগে অবস্থান করত।

সেদিন রাতে একজন লম্বা ও সুঠামদেহী ভারতীয় সেনা অফিসার আমার বাসায় এলেন। আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। আমি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। তিনি ছিলেন কর্নেল পদমর্যাদাপ্রাপ্ত। তিনি আমাকে স্পষ্টভাবে কিন্তু ভদ্র ভাষায় বললেন, সকালে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি হেসে তাকে বললাম—'ফায়ারিং স্কোয়াড কি আমাকে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকবে?' তখনই আশ্চর্যজনক এক ঘটনা ঘটলে। আমি দেখতে পেলাম তার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি আমার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং প্রশ্নের জবাব না দিয়েই সেখান থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। হঠাৎ করে এমন খবর শুনে আমার স্ত্রী, বোন এবং সন্তানেরা আতঙ্কে পাথর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার পরিবার ছিল সাহসী। কিছু সময় পর তারা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। সম্ভবত সেদিন রাতে তারা কেউই ঘুমায়নি। আমি আমার পরিবারের লোকদের সঙ্গে আলাপ, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা এবং ঘুম—এসবের মধ্যে ভাগাভাগি করে রাত কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকালে বেশ কিছু সেনাবাহিনীর গাড়ি আমার বাসভবনকে ঘিরে ফেলল, কিন্তু কেউই প্রবেশ করল না। আমরা দিনের আলো ফুটে সূর্য আরও আলোকিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারা হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ রাখছিল। কিছু সময় পর সেনা গাড়িবহর ঠিক যেভাবে এসেছিল সেভাবেই ফিরে চলে গেল। আমরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষায় রইলাম; কিন্তু কোনো ঘটনাই ঘটল না। হয়তো-বা নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপের কারণে এমনটি হলো। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলল। ঘণ্টা থেকে দিন। দিন পেরিয়ে মাস। মাস পেরিয়ে বছর। এ সময়ের মধ্যে আমাকে নিয়ে কিছুই করা হলো না। আমি তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনেও করতে পারছি না, যা সে সময় ঘটেছিল। তারপর একদিন সৌভাগ্যক্রমে সুযোগ এসে গেল। আমি হায়দারাবাদ ছেড়ে পালালাম। পালিয়ে বাঁচলাম। আমরা অনেকেই বাঁচলাম। কিন্তু চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল স্বাধীন হায়দারাবাদের রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, বিলীন হয়ে গেল বৃহৎ ভারতের মধ্যে!

https://nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট

https://nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট—০১

চেপে রাখা ইতিহাস

হায়দারাবাদ গণহত্যার অতি গোপনীয় তদন্ত প্রতিবেদন

সাহাদত হোসেন খান

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি পদদলিত করে মাত্র পাঁচ দিনে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুসলিম দেশীয় রাজ্য হায়দারাবাদ গ্রাস করে। হায়দারাবাদ দখলের সামরিক অভিযানের সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন পলো'। সর্বাত্মক সামরিক অপারেশন হলেও ভারতের কাছে এ অভিযান 'পুলিশি অভিযান' হিসেবে পরিচিত। ভারতীয় সৈন্যদের স্বাগত জানাতে ১৮ সেপ্টেম্বর ভোর থেকে ভয়ার্ত জনতা রাজধানীর সিকান্দারাবাদ মাঠে সববেত হয়। বুটের তলায় পিষ্ট হওয়ার ভয়ে জনতা ভারতীয় সাঁজোয়াযানে ফুল ছিটিয়ে দেয়। জনতা শ্লোগান দেয়—জয় হিন্দ, মহাত্মা গান্ধী কি জয়, পণ্ডিত নেহেরু জিন্দাবাদ, সরদার প্যাটেল জিন্দাবাদ, জেনারেল চৌধুরী জিন্দাবাদ, হিন্দুস্তানি ফৌজ জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কি জয়। সন্ধ্যা ৭টা থেকে পরদিন ভোর ৬টা নাগাদ কারফিউ জারি করা হয়। জনতা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িঘরে ছুটে যায়। চারদিকে নেমে আসে কবরের নিস্তব্ধতা। শুরু হয় একটি জাতির পরাধীনতার ইতিহাস।

শক্তিপ্রয়োগ করা না হলে হায়দারাবাদ আজও স্বাধীন দেশ হিসেবে টিকে থাকত। ভারত এ দেশীয় রাজ্যে শুধু অন্যায় আগ্রাসন চালিয়েছে তা-ই নয়, ভারতীয় সৈন্যরা সেখানে নির্মম গণহত্যা চালায় এবং ধর্ষণে লিপ্ত হয়েছে। প্রচারণার জোরে একটি কালো দিনকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে পৃথিবীর ইতিহাসের নির্মম গণহত্যার একটি উপাখ্যান। বিশ্ববাসী কথায় কথায় বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, সিয়েরালিয়ন ও রুয়ান্ডায় সংঘটিত গণহত্যা, এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদি হলোকাস্টের ট্রাজেডি স্মরণ করে—স্মরণ করে না কেবল হায়দারাবাদে ভারতীয় সৈন্যদের গণহত্যা। আজ পর্যন্ত কোথাও কেউ হায়দারাবাদে গণহত্যার জন্য ভারতের বিচার দাবি করেনি। কাউকে ভারতের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতেও দেখা যায় না। কী বিচিত্র পৃথিবী!

https://nagorikpathagar.org

হায়দারাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় এজেন্ট জেনারেল কেএম মুন্সী ছিলেন সব ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *দ্য অ্যান্ড অব অ্যান অ্যারা*-তে সব সত্য চাপা দিয়েছেন। ভারতীয়রা নিজেদের কৃত অপরাধ চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও সত্য তার নিজের শক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে। আমেরিকান পর্যটক উইলিয়াম ডালরিম্পল হায়দারাবাদ সফরে গিয়ে সেখানে বিজয়ী ভারতীয় সৈন্য ও তাদের স্থানীয় হিন্দু দোসরদের গণহত্যার সুস্পষ্ট প্রমাণ খুঁজে পান। তিনি তার *দ্যা এজ অব কলি* গ্রন্থের ২০৯-১০ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন— 'পুলিশি অভিযানে নিহতের আনুমানিক একটি সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব বলে আমি উপলব্ধি করি। দিল্লিতে গণহত্যার রিপোর্ট এসে পৌঁছতে শুরু করলে নেহরু 'তার ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে' নিজামের শাসনের কট্টর বিরোধিতাকারী ও কংগ্রেসের প্রবীণ সদস্য হায়দাবাদের দুজন মুসলমান এবং হিন্দু পণ্ডিত সুন্দরলালের নেতৃত্বে একটি বেসরকারি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। এ টিম হায়দারাবাদে ব্যাপকভাবে সফর করে এবং ১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে নেহরু ও সরদার প্যাটেলের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা থাকায় এ তদন্ত রিপোর্ট কখনো প্রকাশ করা হয়নি।'

রিপোর্টের একটি অংশ ভারতের বাইরে পাচার হওয়া নাগাদ তা ছিল অপ্রকাশিত। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে *হায়দ্রাবাদ : আফটার দ্য ফল* শিরোনামে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থে এ উপাখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে 'অপারেশন পলো পরবর্তী হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, ধ্বংসযজ্ঞ এবং হায়দারাবাদ রাজ্যে সম্পত্তি দখল' শিরোনামে একটি রিপোর্টে ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। এ রিপোর্টে হায়দারাবাদ রাজ্যে গ্রামের পর গ্রামে ভারতীয় সৈন্যদের হত্যা, গণধর্ষণ এবং নিরস্ত্র মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিধনে স্থানীয় হিন্দু গুন্ডাদের পরিকল্পিত অপরাধের নির্মোহ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একটি ছোট্ট ঘটনার বর্ণনা থেকে গোটা পরিস্থিতি আঁচ করা সম্ভব :

গাঞ্জোটি পায়গাঁও, ওসমানাবাদ জেলা। এখানে মুসলমানদের ৫০০ বাড়ি ছিল। গুন্ডারা ২০০ মুসলমানকে হত্যা করে। প্রথমে সেনাবাহিনী মুসলমানদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়। মুসলমানেরা অরক্ষিত হয়ে গেলে গুন্ডারা হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে। সৈন্যরা মুসলিম মহিলাদের ধর্ষণ করে। গাঞ্জোটির পাশা বাঈ বলেছেন, সেনাবাহিনী এসে পৌঁছানোর পর গাঞ্জোটিতে গোলযোগ শুরু হয়। এখানকার সব যুবতি মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়। ওসমান সাহেবের পাঁচ কন্যা এবং কাজী সাহেবের ছয় কন্যাকে ধর্ষণ করা হয়। সাইবা চামারের বাড়িতে ইসমাইল সাহেব সওদাগরের কন্যাকে এক সপ্তাহ ধর্ষণ করা হয়। ওমরগাঁও থেকে সৈন্যরা প্রতি সপ্তাহে আসত এবং সারা রাত ধর্ষণের পর যুবতি

https://nagorikpathagar.org

মুসলিম মহিলাদের সকালে বাড়িতে ফেরত পাঠানো হতো। মাহতাব তাম্বুলির কন্যাদের হিন্দুদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেওয়া হয়। বুর্গা জুলাহার বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল একজনকে।

রিপোর্টের প্রতিটি পৃষ্ঠার বর্ণনা অভিন্ন। তাতে বলা হয়—'পুলিশি অভিযানে' হায়দারাবাদে মোট দুই লাখ মুসলমানকে হত্যা করা হয়! নিহতদের এ সংখ্যা অবিশ্বাস্য। রিপোর্টের বর্ণনা সত্যি হয়ে থাকলে উপমহাদেশ বিভক্তিকালে পাঞ্জাবে সংঘটিত গণহত্যার সাথে হায়দারাবাদে 'পুলিশি অভিযান'-এর রক্তগঙ্গাকে তুলনা করা যায়। কেউ হয়তো দুই লাখকে অতিরঞ্জিত মনে করতে পারেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, এ হত্যাকাণ্ড ছিল ভয়াবহ!

জাতিসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি দাবি করেছিলেন, নিজামের সৈন্যরা তাদের চৌকি পরিত্যাগ করার পর কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। এ বিশৃঙ্খলাকালে হিন্দুরা নিজামের স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে কথিত দুর্ভোগের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নেহরু প্রকাশ্যে হায়দারাবাদে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিকে খাটো করে দেখার চেষ্টা করলেও একান্তভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ১৯৪৮ সালের নভেম্বরে সরদার প্যাটেলের মন্ত্রণালয়ে নেহরুর পাঠানো একটি চিঠিতে তার প্রতিফলন ঘটেছে। চিঠিতে নেহরু উল্লেখ করেছিলেন, তিনি শিউরে ওঠার মতো বিপুল মুসলিম হত্যাকাণ্ড এবং অবিশ্বাস্য মাত্রায় মুসলমানদের সম্পত্তি লুণ্ঠনের রিপোর্ট পেয়েছেন। এসব ঘটনা পণ্ডিত সুন্দরলালের রিপোর্টের সার্বিক ধারণাতে সত্যি বলে প্রমাণ করছে।

ইসলামি ইতিহাস বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক উইলফ্রেড কার্টওয়েল স্মিথও হায়দারবাদে মুসলিম গণহত্যা সম্পর্কে আমেরিকান পর্যটক উইলিয়াম ডালরিম্পলের অনুরূপ মতামত দিয়েছেন। ১৯৪৯ সালে হায়দারাবাদ সফর শেষে তিনি লিখেছেন—

> রণাঙ্গনের বাইরে মুসলিম সম্প্রদায় ব্যাপক ও নৃশংস দুর্ভাগ্যের শিকার হয়। হাজার হাজার লোককে হত্যা এবং লাখ লাখ লোককে গৃহহীন করা হয়। অবশ্যই প্রতিহিংসা তাদের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। বিশেষ করে এ রাজ্যের মারাঠা এবং অন্যান্য এলাকায় এখনো প্রতিহিংসার নিষ্ঠুর স্বাক্ষর বিদ্যমান। 'পুলিশি অভিযানের' পরবর্তী দিনগুলোর উপাখ্যান খুবই করুণ।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হায়দারাবাদে ভারতীয় সৈন্যদের নৃশংসতার রিপোর্ট প্রণয়নে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন। এ তদন্ত কমিটি নেহরুর কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টটি কখনো আলোর মুখ দেখেনি। কিন্তু ফাঁকফোকর দিয়ে এ রিপোর্ট ফাঁস হয়ে যায়। মুসলিম দেশীয় রাজ্য

https://nagorikpathagar.org

হায়দারাবাদে ভারতীয় সৈন্যদের নৃশংসতার বিবরণসংবলিত অতি গোপনীয় এ রিপোর্টটি হুবহু তুলে ধরা হলো :

প্রতি

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার, নয়াদিল্লি।

২. মাননীয় রাজ্যমন্ত্রী, ভারত সরকার, নয়াদিল্লি।

মহোদয়

ভারত সরকার আমাদের হায়দারাবাদ রাজ্যে একটি শুভেচ্ছা সফরে যাবার জন্য অনুরোধ করে। আমাদের কাজ শেষ করে এখন আমরা আমাদের রিপোর্ট পেশ করছি।

১. পণ্ডিত সুন্দরলাল, কাজী আবদুল গফুর ও মাওলানা আবদুল্লাহ মিশরির সমন্বয়ে গঠিত এই প্রতিনিধিদল ২৯ নভেম্বর হায়দারাবাদে গিয়ে পৌঁছে এবং ১৯৪৮ সালের ২১ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে ফিরে আসে। এ সময় আমরা রাজ্যের ১৬টির মধ্যে ৯টি জেলা, সাতটি জেলা সদর, ২১টি শহর ও ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম সফর করেছি। এ ছাড়া আমরা এ ধরনের ১০৯টি গ্রামের পাঁচ শতাধিক লোকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় ৩১টি জনসমাবেশ এবং হিন্দু, মুসলিম, কংগ্রেস সদস্য, জমিয়তে উলামা, ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের কর্মকর্তা, কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও ছাত্র, প্রগোসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও হিন্দুস্তানি প্রচার সভার ২৭টি ঘরোয়া সমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন।

আমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : হায়দারাবাদের মহামান্য নিজাম, বেরারের মহামান্য প্রিন্স, মেজর জেনারেল চৌধুরী, মি. বাখলু, মুখ্য বেসামরিক প্রশাসক, স্বামী রমানন্দ তীর্থ, ড. মালকোত রামচন্দ্র রাও, রামাচার্য, কে. বৈদ্য, ভেঙ্কট রাও, আবুল হাসান সৈয়দ আলি, নওয়াব আলি ইয়ার জং, নবাব জৈন ইয়ার জং, রাজা ধোন্দি রাজ, মাওলানা আবু ইউসুফ, মৌলভী আবদুল খায়ের ও মৌলভী হামিদউদ্দিন কামার ফারুকী।

এসব সমাবেশ ও সাক্ষাৎকারে আমরা দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং বজায় রাখার মূল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। নিজেদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করার এবং অতীতের তিক্ততা ভুলে যাওয়ার জন্য জনগণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছি।

https://nagorikpathagar.org

তাদের কাছে ভারত সরকারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছি এবং হায়দারাবাদের জনগণের জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছি। আমরা তাদের সামনে ব্যাখ্যা করেছি যে, ধর্মনিরপেক্ষ সরকারে ধর্ম-বর্ণ ও শ্রেণিনির্বিশেষে তাদের সবাই সমান অধিকার ও নাগরিক সুবিধা ভোগ করবে এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সবার সমান সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

তাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ নীতি বাস্তবায়ন করা সামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব। সুযোগ পাওয়ামাত্র আমরা আমাদের অবস্থানের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছি যে, পুলিশি অভিযানের আগে বা পরের ঘটনাবলি তদন্ত বা অনুসন্ধান করার জন্য কোনো কমিশন হিসেবে আমরা কাজ করছি না। আমরা এসেছি একটি শুভেচ্ছা মিশনে এবং আমাদের দায়িত্ব হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার করা। একই সঙ্গে আমরা যা প্রত্যক্ষ করেছি এবং যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি, সেসব তথ্য আপনার নজরে আমাদের আনা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। আমাদের মতে, এসব তথ্য গুরুত্বপূর্ণ।

২. ১৬টি জেলা এবং আনুমানিক ২২ হাজার গ্রাম নিয়ে হায়দারাবাদ রাজ্য গঠিত। এসব জেলার মধ্যে মাত্র তিনটি পুরোপুরি না হলেও বাস্তবে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ থেকে মুক্ত ছিল। রাজাকারদের তৎপরতাকালে এবং এ মিলিশিয়া সংগঠনের পতন ঘটার পর প্রতিশোধমূলক প্রতিক্রিয়ার সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রাজ্যটি আক্রান্ত হয়। অন্য চারটি জেলায় সাম্প্রদায়িক গোলাযোগ ছিল আরও মারাত্মক। তবে এ চারটি জেলার গোলযোগ অবশিষ্ট আটটি জেলার মতো এত শোচনীয় ছিল না। এই আটটি জেলার মধ্যে আবার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলো হচ্ছে ওসমানাবাদ, গুলবার্গ, বিদার ও নান্দেন। এ চারটি জেলায় পুলিশি অভিযানকালে এবং পরে ১৮ হাজারের কম লোক নিহত হয়নি। অন্য চারটি জেলা আওরঙ্গাবাদ, বীর, নলগুন্দা ও মিদাকে কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক জীবন হারিয়েছে। আমরা অত্যন্ত রক্ষণশীল হিসেবে বলতে পারি যে, পুলিশি অভিযানকালে এবং পরে গোটা রাজ্যে কমপক্ষে ২৭ থেকে ৪০ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে। কর্তৃপক্ষ আমাদের অবহিত করেছে যে, ওই আটটি জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আমাদের প্রতিনিধিদলের সেখানে সফর খুবই জরুরি। অতএব, আমরা ওই সব জেলায় আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করি এবং আমরা বলতে পারি যে, পারস্পরিক শত্রুতা ও অবিশ্বাস প্রশমনে আমরা সফল হয়েছি। এটা একটি

https://nagorikpathagar.org

তাৎপর্যপূর্ণ সত্য যে, এই আটটি জেলার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত চারটি জেলা ছিল (ওসমানাবাদ, গুলবার্গ, বিদার ও নান্দেন) নিজামের স্বেচ্ছাসেবকদের মূল ঘাঁটি, লাতুরর হচ্ছে কাসেম রিজভীর নিজ শহর। এখানে ধনাঢ্য কুচ্চি মুসলিম বণিকেরা বসবাস করত। এই বিরাট বাণিজ্যিক কেন্দ্রে ২০ দিনের বেশি হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ছিল। ১০ হাজার মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে আমরা সেখানে বড়ো জোড় তিন হাজার লোককে এখনো অবস্থান করতে দেখেছি। এক হাজারের বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে এবং বাদবাকিরা কোনো রকমে জীবনও নিয়ে পালিয়ে গেছে এবং তারা অর্থনৈতিকভাবে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

৩. প্রায় প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা কেবল হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, কোনো কোনো জায়গায় মহিলা ও শিশুরাও রক্ষা পায়নি। হত্যাকাণ্ডের সাথে সাথে মহিলাদের ধর্ষণ, অপহরণ (কখনো কখনো শোলাপুর ও নাগপুরের মতো রাজ্যের বাইরে ভারতীয় শহরে), লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, মসজিদের প্রতি অসম্মান, বলপূর্বক ধর্মান্তর, বাড়িঘর ও জমিজমা দখল করা হয়। শত শত কোটি রুপি মূল্যের সম্পদ লুট ও ধ্বংস করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা ছিল মুসলমান। এসব অসহায় মুসলমান ছিল গ্রামাঞ্চলের সংখ্যালঘু। নৃশংসতার জন্য দায়ী অপরাধীদের মধ্যে শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে নিগৃহীত ব্যক্তিরা ছিল তা নয়, হায়দারাবাদের অমুসলিমরাও নয়, সীমান্তের বাইরের নিরস্ত্র-অস্ত্রধারী ব্যক্তি ও দুর্বৃত্তরা হায়দারাবাদের অমুসলিমদের এ দুষ্কর্মে সহযোগিতা করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযানের পর এসব দুর্বৃত্ত অনুপ্রবেশ করেছিল। আমরা সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি যে, শোলাপুর ও ভারতের অন্য শহরের একটি সুপরিচিত হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনের বেশ কিছু সশস্ত্র ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কতিপয় স্থানীয় লোক এবং বাইরের কমিউনিস্টরা এসব দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা দাঙ্গাকারীদের নেতৃত্ব দিয়েছে।

৪. কর্তব্য আমাদের এ কথাও বলতে বাধ্য করছে যে, আমাদের কাছে এ মর্মে নিঃসন্দেহে অকাট্য প্রমাণ আছে, বহু ঘটনায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য এবং স্থানীয় পুলিশ লুটতরাজ এবং অন্যান্য অপরাধে অংশগ্রহণ করেছে। আমাদের সফরকালে আমরা এমন তথ্য সংগ্রহ করেছি যে, সৈন্যরা মুসলমানদের দোকানপাট ও বাড়িঘরে লুটপাট চালাতে হিন্দু জনতাকে উৎসাহিত এমনকি কোনো কোনো ঘটনায় বাধ্য করেছে। একটি জেলা শহরে বর্তমান প্রশাসনের হিন্দুপ্রধান আমাদের জানিয়েছে, সশস্ত্রবাহিনী মুসলমানদের

https://nagorikpathagar.org

দোকানপাটে নির্বিচারে লুণ্ঠন চালিয়েছে। আরেকটি জেলায় সৈন্যরা একজন মুন্সেফসহ অন্যদের বাড়িঘর লুট করেছে এবং একজন তহসিলদারের স্ত্রীর সম্ভ্রমহানি ঘটানো হয়েছে। বিশেষ করে শিখ সৈন্যদের বিরুদ্ধে মহিলাদের সম্ভ্রমহানি ঘটানোর এবং অপহরণ করার অভিযোগ কোনোক্রমেই নগণ্য ছিল না। আমাদের অবহিত করা হয়েছে যে, বহু জায়গায় সশস্ত্রবাহিনী লুণ্ঠিত সম্পদ, নগদ অর্থ, স্বর্ণ ও রৌপ্য নিয়ে গেছে এবং অবশিষ্ট লুণ্ঠিত মালামাল জনতার হাতে পড়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেনাবাহিনীর মধ্যে এমন কিছু সদস্য ছিল যারা সাম্প্রদায়িক আবেগ মুক্ত ছিল না। কেননা তাদের কেউ কেউ অন্যত্র তাদের আত্মীয়স্বজনদের ওপর নৃশংসতার কথা ভুলতে পারেনি।

পাছে আমাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর কলঙ্ক আরোপ করার জন্য যাতে অভিযুক্ত করা না হয়, সেজন্য আমরা আমাদের সুচিন্তিত মতামত রেকর্ড করেছি যে, হায়দরাবাদে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বাহিনীর অফিসাররা উঁচু মানের শৃঙ্খলা ও কর্তব্য জ্ঞান বজায় রেখেছেন। আমরা জেনারেল চৌধুরীকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখেছি, যার মধ্যে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তিনি হলেন কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ ও আগাগোড়া একজন ভদ্রলোক।

মুসলমানদের রক্ষায় এমন উদাহরণ আমাদের কাছে পেশ করা হয়েছে যে, হিন্দুরা তাদের প্রতিবেশী মুসলিম নরনারীকে তাদের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে রক্ষা করেছে। কোনো কোনো পেশাজীবীদের মধ্যে সহমর্মিতা ছিল অত্যন্ত লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু তাঁতিরা হিন্দুদের আক্রমণ থেকে মুসলিম তাঁতিদের রক্ষা করেছে এবং কখনো কখনো নিজেরা অনেক চড়া মূল্য দিয়ে (প্রাণহানিসহ) তাদের আশ্রয় দিয়েছে। বহু হিন্দু অপহৃত মুসলিম মহিলাদের উদ্ধারে সহায়তা করেছে।

৫. পুলিশি অভিযানের পরে এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের পতনের পরিণামে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বেঁধে যায়। নিজামের স্বেচ্ছাসেবকেরা ছিল সরকার প্রতিষ্ঠার পথে কার্যকর অন্তরায়। হায়দারাবাদের মুসলমানদের কাছে একটি দায়িত্বশীল সরকার ছিল হিন্দু রাজের সমার্থক। কেননা, এ সরকার প্রতিষ্ঠা করা হতো সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ইচ্ছার ভিত্তিতে। এ সত্য অনুধাবনে মুসলমানদের বিলম্ব হয় যে, তাদের দুর্ভোগ হচ্ছে মাত্র কয়েক দিন আগে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। স্বেচ্ছাসেবকদের আন্দোলনের প্রতি হায়দারাবাদের বিপুলসংখ্যক মুসলমানের সহানুভূতি ছিল। কেউ কেউ উন্মত্ততার প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে গিয়ে তাদের গোঁয়ার্তুমির জন্য চরমমূল্য দিয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

তাদের গোঁয়ার্তুমি এমন ছিল যে, তাদের একজন আততায়ীর বুলেটে প্রাণ দেয়। তাদের মতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিরা এমন একটি বিশ্বাসে উৎসাহ বোধ করেছিল যে, তাদের পেছনে কর্তৃপক্ষের সমর্থন আছে।

শেষ করার আগে আমাদের মূল্যবান সহায়তা এবং স্বপ্রণোদিত সহযোগিতা করার জন্য হায়দরাবাদের সামরিক প্রশাসন, আমরা যেসব জেলা সফর করেছি সেসব জেলার সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সর্বশেষ আমাদের দুজন সচিব মি. ফারুক সায়ার ও পিপি আম্মুলকারের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

[এই নিবন্ধটি 'বিস্মৃতির অতলে হায়দারাবাদ' শিরোনামে ১২ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে দৈনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়]

https://nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট—০২

আত্মসমর্পণের সেই কুখ্যাত দিন

আরিফুল হক

১৯৪৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর হায়দারাবাদ বাহিনীর সেনাপতি মেজর জেনারেল আল ইদরুস রাজধানী হায়দারাবাদের বাইরে ভারতীয় বাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জে এন চৌধুরীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। অস্ত্র সমর্পণের সেই অনুষ্ঠানে আল ইদরুস ছাড়া হায়দারাবাদের আর কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

সেনা আত্মসমর্পণের পর নিজাম বাহাদুর ব্যক্তিগত দূত হিসেবে জুলকদর জং, আবুল হাসান সৈয়দ, আলি ইয়ার জং প্রমুখকে মেজর জেনারেল জে এন চৌধুরীর কাছে পাঠালেন এই আশায় যে—তিনি যেন তাদেরই প্রতিনিধি কেএম মুন্সীর নির্দেশে গঠিত নতুন বেসামরিক মন্ত্রিসভাকে স্বীকৃতি দান করেন। জেনারেল চৌধুরী সকলকে বিস্মিত করে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন—কোনো মন্ত্রিসভা নয়, হায়দারাবাদে সামরিক শাসন জারি করা হবে এবং সরকারের দায়িত্বভার তিনি নিজ হাতে গ্রহণ করবেন।

মহামান্য নিজাম ভারতীয় সেনাপতির কথা শুনে বেদনায় আর্তনাদ করে উঠলেন। পাশে দাঁড়ানো পুরোনো সহকর্মী মীর লায়েক আলিকে সম্বোধন করে বললেন—মুন্সীর সাথে তো আমার এ রকম চুক্তি হয়নি।

মীর লায়েক আলি বিনয়ের সাথে বললেন—‘আলা হজরত, পরাজিতের সাথে বিজয়ীর কোনো চুক্তি হয় না; শুধু তাকে নির্দেশ মান্য করতে বলা হয়।’

এরপর ভারতীয় নির্দেশে জেনারেল জে এন চৌধুরীকে সামরিক গভর্নর এবং ডি এস বাখলেকে প্রধান বেসামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঁচ সদস্যের সামরিক মন্ত্রিসভা হায়দারাবাদের শাসন ভার গ্রহণ করল।

নতুন সামরিক সরকার দেশে নির্যাতনের স্টিমরোলার চালাল। তারা কাসেম রিজভীর ২ লক্ষ রাজাকার বাহিনীকে নির্মূল করল। প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলি ও কাসেম রিজভী গৃহবন্দি হলেন। সাত পুরুষের মহামান্য নিজাম বাহাদুরের প্রাসাদের টেলিযোগাযোগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ঔদ্ধত্যও

https://nagorikpathagar.org

দেখাল ভারতীয় শাসকরা। মীর লায়েক আলি গৃহবন্দি অবস্থায় থেকে ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে সপরিবারে বন্ধে হয়ে করাচি চলে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতীয় আগ্রাসী শাসকরা হায়দারাবাদের বীর সন্তান কাসেম রিজভীকে পরে ত্রিমূল ঘেরী কারাগারে বন্দি করে রাখে।

১৯৪৮ সালে স্বাধীন হায়দারাবাদ দখলের পর ধূর্ত ভারতীয় রাজনীতিবিদরা, বিশ্বের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে মহামান্য নিজামকে কিছু দিনের জন্য রাজপ্রমুখ মর্যাদায় ভূষিত করলেও নিজাম মীর ওসমান আলি খান আসফজাই রাজবংশের ৭ম এবং শেষ প্রদীপ হিসেবেই একদিন নিভে গেলেন। আজ সেই নিজামও নেই, সেই হায়দারাবাদও নেই। শকুনের দল তার দেহটাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। হায়দারাবাদের বিশাল রাজ্য এখন অন্ধ্রপ্রদেশ—মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাডু প্রভৃতি রাজ্যের সাথে তাকে বিলীন করে দেওয়া হয়েছে। সেই বিখ্যাত চার মিনার, মক্কা মসজিদ, জামে মসজিদ, নিজাম প্যালেস হয়তো আছে; কিন্তু দিল্লির উন্নত শির লাল কেল্লার মতোই অধমদের নোংরা কর্দমাক্ত পদভারে পিষ্ট হয়ে শ্রীহীন বিবর্ণ এবং লজ্জায় কুঁকড়ে আছে।

আসফজাহ বংশের শেষ প্রদীপ মীর ওসমান আলি খানের ভালোবাসার সেই পঙ্‌ক্তিমালা আজও হয়তো হায়দারাবাদের আকাশে-বাতাসে হাহাকার করে বলছে—

নহি মুসকিন কে ছুটে, দেখ ওসমান
মুহব্বত হো গয়ি, মুলকে ডেকান সে

[তোমার পক্ষে সম্ভব নয় হে ওসমান, যে তুমি ডেকান-এর ভালোবাসা পরিত্যাগ করো]

জন্মভূমির প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও হতাশা নিয়ে ৭ম এবং শেষ নিজাম মীর ওসমান আলি খান ১৯৬৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টা ২২ মিনিটে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু তার অতৃপ্ত আত্মা হয়তো আজও তার সাধের হায়দারাবাদ রাজ্যকে খুঁজে ফিরছে। স্বাধীনতা গ্রাস করার সাথে সাথে আগ্রাসী ভারতীয় শক্তি যে তাঁর প্রিয় হায়দারাবাদের চিহ্নটুকুও মুছে দিয়েছে, সে কথা আজ তাকে কে বলে দেবে! হায়দারাবাদ সেদিন পশুশক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু ৫০ বছর পর আজও হায়দারাবাদের বুকে কান রাখলেই হৃৎপিণ্ডের আওয়াজের সাথে জাতীয় সংগীতের সেই গুঞ্জন শোনা যাবে—

https://nagorikpathagar.org

তা বাদ খালিক-ই আলম ইয়েহ্ রিয়াসাৎ রাখ্যে
তোবাকো ওসমান বা-সাদ আজলাল সালামাত রাখ্যে।

May Allah Preserve this state till eternity and
May Allah Keep Osmany in all his grandeur.

[হায়দারাবাদের ট্র্যাজেডি ও আজকের বাংলাদেশ, লেখক : আরিফুল হক। প্রকাশক : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, চট্টগ্রাম-ঢাকা, প্রকাশকাল-২০০১]

https://nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট—০৩

আজকের বাংলাদেশ

আরিফুল হক

উপনিবেশবাদীদের চক্রান্তে হায়দারাবাদের সেই ঔজ্জ্বল্য নিভে গেছে। ১৯৪৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর দ্বিমুখী সেনা অভিযান চালিয়ে ভারত স্বাধীন হায়দারাবাদ গ্রাস করে নেয়। শুধুই কি হায়দারাবাদ? স্বাধীন দেশীয় রাজ্য জুনাগড়, মানভাদর, গোয়া ও সিকিম একইভাবে ছলে বলে কৌশলে ভারতের উদরে চলে গেছে। কোথাও সেনা হামলা চালিয়েছে—কোথাও দেশের অভ্যন্তরে রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, যুবশ্রেণি, এমনকি নানান পেশাজীবীর মধ্যে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর সৃষ্টি করে, তাদের অর্থ, পদ, পদক ইত্যাদির লোভ দেখিয়ে, দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা অরাজকতা সৃষ্টি করে, আপন উদ্দেশ্য হাসিল করেছে। অর্থাৎ সেই দেশে আধিপত্য বিস্তার করেছে কিংবা দেশটি দখল করে নিয়েছে। ভারত কর্তৃক সিকিম দখল আগ্রাসনের আরও একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। ১৯৪৭-এর পর থেকেই ভারত সিকিমে কয়েকটি পোষ্য রাজনৈতিক দল পুষে আসছিল। ভারতের পোষ্য এই সব রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রভুর নির্দেশে দেশে বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক হানাহানি, বোমা বিস্ফোরণ, হরতালসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এমনই অবনতি ঘটায় যে, সে দেশের ধর্মরাজা চেগিয়ালের পক্ষে দেশ শাসন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তিনি ভারতের পরামর্শে তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে দেশে নির্বাচন দিয়ে শাসনক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। নির্বাচিত সেই সরকারের প্রধান কাজী লেন্দুপ দর্জি ১৯৭৫ সালের ১০ এপ্রিল সিকিম জাতীয় পরিষদে এক প্রস্তাব পাশ করে চেগিয়াল-এর (রাজা) পদ বিলোপ করে এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে মিশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭৫ সালের ২৬ এপ্রিল ভারতীয় সংবিধানের ৩৮তম সংশোধনী পাশ করে ভারত স্বাধীন সিকিম রাজ্যকে তার ২২তম প্রদেশ হিসেবে আত্মসাৎ করে ফেলে। সংসদীয় গণতন্ত্রই যে দেশের স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষা কবচ নয়, সিকিমই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ছাড়াও স্বাধীন শ্রীলঙ্কায় বিদ্রোহ সৃষ্টিকারী তামিল টাইগার বাহিনী এবং তাদের নেতা প্রভাকরণ ভারতেরই সৃষ্টি।

https://nagorikpathagar.org

ভারতের সৃষ্ট গফফার খান, ওয়ালী খান এবং তাদের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি পাখতুনিস্তানের দাবি তুলে সে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে স্বাধীন আফগানিস্তানকে ভারতের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করেছিল। ভৌগোলিক অসংলগ্নতা এবং যোগাযোগের অসুবিধার কারণে তাদের সে চক্রান্ত সফল হয়নি। তবে আফগানিস্তানে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধাবস্থা জিইয়ে রাখার জন্য ভারত কম দায়ী নয়।

পাকিস্তানকে খণ্ড বিখণ্ড করার জন্য প্রথমে জি এম সৈয়দের নেতৃত্বে 'জিয়ে সিন্ধ' আন্দোলন শুরু করেছিল। বর্তমানে পাকিস্তানের হৃৎপিণ্ড করাচী বন্দরকে বিচ্ছিন্ন করার অসদুদ্দেশ্যে মুত্তাহিদা কওমী মজহার 'এম কিউ এম' নামক পার্টির মাধ্যমে সে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলেছে। এই দলটির নেতা আলতাফ হোসেন ভারতীয় পয়সায় লন্ডনে বেশ আরাম-আয়েশে দিন গুজরান করছে বলে সেদেশের জনগণ বিশ্বাস করে।

ভারত শান্তিপ্রিয় মালদ্বীপে সৈন্য সমাবেশ করেছিল। কাশ্মীরের ৬০ লাখ নিরস্ত্র মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অস্বীকার করে ৬ লক্ষ সশস্ত্র ভারতীয় সৈন্যের বুটের তলায় তাদের স্বাধীনতার স্পৃহাকে দীর্ঘদিন ধরে দাবিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ সার্বিকভাবে বিচার করলে ভারতকে একটি শান্তিপ্রিয়, বন্ধুবৎসল, হিতৈষী, সৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভাবার কোনো কারণ নেই। ভারত তার আচরণে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে ভালো আচরণ কখনো করেনি; বরং সততই আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছে।

এ কারণে চীনের সাথে তার সম্পর্ক সুস্থ নয়, বিশ্বের প্রাচীনতম হিন্দু রাষ্ট্র হয়েও নেপাল নিরাপদ মনে করছে না নিজেকে, ভুটানকে পায়ের তলে দাবিয়ে রেখেছে, পাকিস্তানের সাথে তিনবার প্রত্যক্ষ যুদ্ধসহ প্রতিনিয়ত গোলাগুলি বিনিময় হচ্ছে, শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি সদা উত্তপ্ত। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে ৫৫,৮১৩ বর্গমাইল এলাকা বিস্তৃত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়; যার তিন দিকই প্রায় ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে ঘেরা, একদিকে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর, সেখানে টহল দিচ্ছে শক্তিশালী ভারতীয় ব্লু-ওয়াটার নেভি। এ রকম একটা বৈরী পরিবেশে বসবাস করে বাংলাদেশকে তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

ভারত কোনো দিনই তার আশেপাশে ভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর *ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া* নামক বইতে দক্ষিণ এশিয়াব্যাপী হিন্দু সভ্যতার প্রভাববলয় সৃষ্টির আবেগ আচ্ছন্ন

https://nagorikpathagar.org

মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। বিখ্যাত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী নিরোদ চৌধুরী এক তথ্য ফাঁস করে বলেছেন—৪৭ থেকে ৫০ সাল পর্যন্ত জওহরলাল নেহেরু তিনবার পুলিশ অ্যাকশন করে হায়দারাবাদের মতো বাংলাদেশ দখলের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি আরও বলেন—জয় প্রকাশ নারায়ণ সৈন্য ঢুকিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গ্রাস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ভারতীয় নেতারা বরাবরই অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখে এসেছেন। ভারতীয় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন—'ভারত বিভাগ করতে হলে আমার মৃত দেহের ওপর করতে হবে। যতই রক্তপাত হোক, এক ইঞ্চি পাকিস্তানও আমি সমর্থন করব না।' তিনি বলেন—'If India leads a blood bath, She shall have it.' ভারতের বিখ্যাত লেখক বিমলানন্দ শাসমল তাঁর *ভারত কি করে ভাগ হল* বইতে লিখেছেন—'গান্ধী বলেছিলেন, ভারত বিভাগ মানে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। পাকিস্তানের জন্য এক ইঞ্চি জমি দেওয়াও ঠিক হবে না।'

তিনি আরও লিখেছেন—'মাউন্ট ব্যাটেন রাতারাতি পার্টিশন প্ল্যান তৈরি করলেন এবং নেহেরু ও প্যাটেলকে দিয়ে তাদের সমর্থনে সেটি সই-ও করিয়ে নিলেন। জিন্নার পাকিস্তানকে খর্ব করার জন্য বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করবার ব্যবস্থা রাখা হোল।' ভারতীয় নেতা বল্লভ ভাই প্যাটেল বলেছিলেন—'পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোনোভাবেই অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না, আজ হোক কাল হোক আমাদের সঙ্গে তাদের মিলতেই হবে।'

যে ভারতীয় নেতারা অখণ্ড ভারত ছাড়া কিছু ভাবতেই পারেনি, সেই ভারত ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করার আগ্রহ নিয়ে ছুটে এলো কেন, সেই উদ্দেশ্যটি সত্যই রহস্যে ঘেরা। এই রহস্যের জট খুলে প্রখ্যাত সাংবাদিক মাসুদুল হক তাঁর *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং 'সিআইএ'* বইতে লিখেছেন—

> ১৯৬২ সালের চীন ভারত সীমান্ত যুদ্ধে আইউব খানের ভূমিকায় পাকিস্তান সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ভারত। পাকিস্তানকে দুর্বল করার লক্ষ্যে সে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা নেয়। ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার ওপর সে পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব অর্পিত হয়।

ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক অশোক রায়না তাঁর *ইনসাইড 'র'* বইয়ের ৭ম অধ্যায়ে 'অপারেশন সিকিম' পর্যায় বর্ণনাকালে লিখেছেন—'অপারেশন বাংলাদেশ শেষ।

https://nagorikpathagar.org

এক মাস পর একজন ঊর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা 'র' প্রধানের অফিসের বারান্দা দিয়ে হেঁটে সভাকক্ষের দরজার নিকটে এসে থামলেন। টোকা দেওয়ার পূর্বেই তাঁকে সাদরে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। চারজন লোক নীরবে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। শান্ত-নীরব পরিবেশ তপ্ত-চঞ্চল হয়ে উঠল মুহূর্তে—'ভালো দেখিয়েছেন, (পাকিস্তান দ্বিখণ্ডীকরণ) কাজটা ভালোভাবেই হয়েছে। এখন আমাদের পরবর্তী কাজ নিয়ে চিন্তা করতে হবে।' বাকি চারজন বিস্মিত হয়ে ভেবেই পেলেন না এরপর আবার কী। 'সিকিম জেন্টলম্যান সিকিম—দেখুন এটা নিয়ে কি করতে পারেন।'

সাংবাদিক মাসুদুল হক তাঁর *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং 'সিআইএ'* বইতে আরও লিখেছেন—'বাংলাদেশ একটা প্রকৃত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠুক, ভারত তা কখনো চায় না।' ১৯৭০ সালের ৩১ জানুয়ারি লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় ওয়াল্টার সোয়ার্জ লিখেছিলেন—

> বাংলাদেশ ভারতীয় অস্ত্র এবং কূটনীতির শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর। বাংলাদেশ মুক্তির কাহিনি প্রায় পাঠ্যবই-এর অনুশীলনীর মতোই চলেছিল এবং কূটনীতির প্রতি ধাপ তদারকি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং। তিনি এমন সুকৌশল এবং সূক্ষ্মতার সাথে কাজটি পরিচালনা করেছিলেন, যা নয়াদিল্লির কূটনীতিতে সচরাচর দেখা যায় না।

এই সব মন্তব্য এবং পরবর্তী ঘটনা পরম্পরা স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, ভারত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করতে ছুটে এসেছিল এক সুদূরপ্রসারী দূরভিসন্ধি নিয়ে। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় লেখক ও সাংবাদিক শ্রী বিমলানন্দ শাসমল তাঁর *ভারত কি করে ভাগ হল* বইতে লিখেছেন—

> বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেবার জন্য আমরা ভারতীয়রা কৃতিত্বের দাবি করি এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সেই জন্য ওই সময়ে এশিয়ার মুক্তিসূর্য বলেও অভিহিত করা হতো। কিন্তু বিনীতভাবে বলতে চাই, যে লোকটির জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারলো তাঁর নাম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পূর্ব বাংলার মুসলমানরা জিন্নার আহ্বান অগ্রাহ্য করে যদি পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে ভারতে যোগ দিতেন এবং তার দশ-বিশ বছর বাদে যে কারণে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলেন, অর্থাৎ ভাষা পার্থক্যের জন্য ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে চাইতেন, তাহলে শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা বাঙালিরা কি ফুলের মালা দিয়ে পূজা করতাম না রাস্তায় গুলি করে মারার দাবি জানাতাম? প্রায় একই কারণে শেখ আবদুল্লাহকে কত বছর কারাগারে থাকতে হয়েছিল—নিশ্চয়ই সে কথা

https://nagorikpathagar.org

> কেউ ভোলেন নি। পাকিস্তানে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে তারপর পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবি জানালে পাকিস্তান পূর্ব বাংলায় যে অত্যাচার করেছিল, আমাদের ভারতবর্ষে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে তারপর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবি জানালে ভারতবর্ষ পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের চেয়ে বেশি না হোক কম অত্যাচার করত না। মিজোনাগাদের ওপর আমরা যে অত্যাচার করেছিলাম, পৃথিবীর লোক কোনো দিন সে সংবাদ জানতে পারবে না। ভারতের মত শক্তিশালী দেশের সঙ্গে লড়াই করার জন্য ক্ষুদ্র পাকিস্তান বা পৃথিবীর কোনো দেশের কার্যকরী সাহায্য পূর্ব বাংলার লোকেরা পেতেন না। ভাগ্যবশত পূর্ব বাংলা পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল বলেই সহজে স্বাধীন হতে পারলো, না হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দূর অস্ত হয়ে থাকতো।

তিনি আরও লিখেছেন—

> আর একটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে আমার মনে থেকে গেছে, যার কোনো সদুত্তর আমি পাইনি। একথা সবাই জানেন, ভারতীয় সৈন্য পূর্ব বাংলায় যেতে না পারলে পূর্ব বাংলা স্বাধীন করা যেত না। গোপনে যে ধরনের সাহায্য (বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের) দেওয়া হয়েছিল, তাতে একটা দেশকে স্বাধীন করা যায় না। পূর্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী ভারতে এসে পড়ায় ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে এই যুক্তিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত—এই দাবি নিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কার্যকরী কিছু করতে অনুরো জানালেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। পৃথিবার কোনো দেশই এ ব্যাপারে ভারতকে কিছু অর্থ ভিক্ষা ছাড়া আর কিছু করতে রাজি হলো না। সত্য হোক মিথ্যা হোক একথাও তখন অনেকে বলতেন যে, এই লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর ভারতে আগমনও একটি ষড়যন্ত্রের ফল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একই ব্লুপ্রিন্ট হায়দারাবাদেও অনুসরণ করা হয়েছিল। হায়দারাবাদ দখলের পূর্বে সেখানেও নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ভয়ভীতি ছড়িয়ে শরণার্থীদের ভারতে প্রবেশের জন্য প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। তারপর বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হয়েছিল—হায়দারাবাদে অমুসলিমদের জানমালের নিরাপত্তা নেই, সেখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এমতাবস্থায় ভারত চুপ করে বসে থাকতে পারে না। দেরিতে হলেও বাংলাদেশের মানুষের মোহমুক্তি ঘটতে শুরু করেছে। তারা স্বাধীনতা শব্দটি বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর প্রকৃত অবয়ব নির্মাণ করতে চাইছে। কে শত্রু, কে মিত্র চিহ্নিত করতে চাইছে।

https://nagorikpathagar.org

এক সাংবাদিক লিখেছেন—১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত আমাদের সাহায্য করেছিল যে কারণে, সেই কারণগুলো হলো : ১. পাকিস্তান ভাঙা, ২. বাংলাদেশকে ১৯৪৭ সালের পূর্বাবস্থার মতো ভারতের অর্থনীতির পশ্চাদ্ভূমিতে পরিণত করা, ৩. দক্ষিণ এশিয়ায় সার্বভৌম শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলাদেশকে আশ্রিত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা। যুদ্ধ পূর্বকালীন অস্থায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে ৭ দফা এবং পরবর্তী সময়ে ২৫ দফা বশ্যতা চুক্তি ভারতের সেই আচরণেরই সাক্ষ্য বহন করে। তা ছাড়া ১৯৭২ সালের পরবর্তী তিন বছর ভারত বাংলাদেশের সাথে তার আশ্রিত রাজ্যের মতোই আচরণ করেছিল।

বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান অনুমোদন করার জন্য তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে খসড়া বগলদাবা করে দিল্লি দৌড়াতে হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মরহুম তাজ উদ্দিন আহমদকে ভারতের ডি পি ধরের দুয়ারে ধরনা দিতে হয়েছিল। সেদিন ভারতেরই নির্দেশে নিয়মিত সেনাবাহিনী ধ্বংস করে ভারতীয় সেনার আদলে-ইউনিফর্মে বাংলাদেশকে সশস্ত্র রক্ষী বাহিনী গঠন করতে হয়েছিল। বেরুবাড়ী ভারতকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। বাংলাদেশের মরণফাঁদ ফারাক্কা চালু করার অনুমতি দিতে হয়েছিল।

দিল্লির নির্দেশেই বাংলাদেশের সুসংগঠিত মুদ্রামান ৬৬% হ্রাস করে দেশের সম্পদ ভারতে পাচার করে দিতে হয়েছিল। ভারতে কাঁচা পাট বিক্রির নিষেধাজ্ঞা নিয়ে দেশের সমৃদ্ধ পাটশিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছিল। দু-দেশে ফ্রি যাতায়াতব্যবস্থা এবং বর্ডার ট্রেড চালু করে চোরাচালান ব্যাবসাকে অবারিত করা হয়েছিল। ভারতের অনুমতি ছাড়া একটা বন্দুক, এমনকি একটা বেসামরিক নৌযান কেনার অধিকারও বাংলাদেশের ছিল না।

এসব ঘটনা হায়দারাবাদ ট্রাজেডির পর শেষ নিজাম মীর ওসমান আলি খান-এর অসহায়ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাকে রাজপ্রমুখ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে তিনি নখদন্তহীন কাগুজে বাঘ ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। ৭২ পরবর্তী বাংলাদেশ সরকারও তেমনি স্বাধীন নামধারী হলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতের আশ্রিত রাজ্যের মতো আচরণ করে ক্ষমতায় টিকে ছিল।

ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে—কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিরোধ বা দাবি দাওয়াকে পুঁজি করে ভারত সেই দেশে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করে এবং পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে সে দেশের স্বাধীনতা হরণ করে।

https://nagorikpathagar.org

যে মুসলিম শাসিত হায়দারাবাদে ৫০ বছর আগে থেকে সাম্প্রদায়িকতার কথা কেউ শোনেনি; সেই হায়দারাবাদে হিন্দু মহাসভা, আর্য্য সমাজ প্রভৃতির শাখা সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন জোগানো হলো। বংশপরম্পরায় প্রচলিত দেশের নিজস্ব জাতীয় সংগীতের বিরুদ্ধে গান্ধীজির নির্দেশে তাঁর শিষ্য রামানন্দ তীর্থ, নরসীমা রাও, ওয়াই বি চাবন-এর মাধ্যমে 'বন্দে মাতরম' আন্দোলন শুরু করা হলো। মোগল আমল থেকে প্রচলিত সমৃদ্ধ ভাষার পরিবর্তে হিন্দুস্তানি ভাষা প্রচলনের আন্দোলন শুরু করা হলো। সর্বোপরি স্টেট কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট স্বামী রামানন্দ তীর্থের মাধ্যমে সশস্ত্র বিদ্রোহ সৃষ্টি করে হায়দারাবাদ সীমান্ত অঞ্চলকে ফ্রি জোন ঘোষণা করা, কমিউনিস্টদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ সৃষ্টি—এসবই ছিল হায়দারাবাদ দখলের প্রস্তুতিমূলক ড্রেস রিহার্সাল। হায়দারাবাদেও বিশ্বাসঘাতক রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে দেশকে অশান্ত অস্থিতিশীল করে তোলা হয়েছিল। ফলে একদিন সামান্য আঘাতেই হায়দরাবাদের পতন ঘটে। আজ বাংলাদেশের দিকে তাকালে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়।

আজ বাংলাদেশেরই কিছু বুদ্ধিজীবীর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, ৪৭-এর দেশ বিভাগ ভুল ছিল। তারা বলছেন, দ্বিজাতি তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ নাকি অন্যায়। তাহলে ভারতে বাঙালি, পাঞ্জাবি, মাদ্রাজি, মারাঠা, গুর্খা—যাদের আচার-আচরণ, খাদ্য-পোশাক, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ভাষাগত কোনো মিলই নেই—তারা কীভাবে শুধু হিন্দুত্ববাদকে অবলম্বন করে এক জাতি হয়ে বাস করছে, সে কথা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা ভেবেও দেখে না। তারা এ কথাও মনে করে না, হায়দারাবাদে কমিউনিস্ট রাজ্য কায়েম করার জন্যই যদি তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের আগুন জ্বালানো হয়েছিল, তাহলে নিজামশাহির পতনের পর এবং ভারত কর্তৃক হায়দারাবাদ দখলের পর সে আগুন নিভে গেল কেন? সেখানে কমিউনিস্ট রাজ্য কায়েম হলো না কেন?

বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ভারতের সাথে যে ৩০ বছর মেয়াদি পানি চুক্তি করেছে, ভারতের মদতপুষ্ট কতিপয় সশস্ত্র বিদ্রোহী চাকমার সাথে যে শান্তিচুক্তি করেছে, সে অসম বাণিজ্য চুক্তির ফলে দেশ ভারত নির্ভর হয়ে পড়ছে। এ ছাড়াও করিডোর চুক্তি, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার চুক্তি, ট্রানজিট চুক্তি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস চুক্তিসহ ভারতের সাথে সরকার যে যে চুক্তি করতে যাচ্ছে, সকল চুক্তি স্বাক্ষরের আগে তাদের হায়দারাবাদ, জুনাগড়, গোয়া, মানভাদর, সিকিম, কাশ্মীর, নেপাল ও ভুটানের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, দেশটা নানান সংঘাতে, নানান বিপর্যয়ে রুগ্ণ, জীর্ণ, ক্লিষ্ট হয়ে কোনোমতে

https://nagorikpathagar.org

দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে এমন কোনো রাজনৈতিক ঝড় তোলা ঠিক হবে না, যার সামান্য আঘাতেই তাকে হায়দারাবাদের বা সিকিমের ভাগ্যবরণ করতে হয়। বহু দামে কেনা এই স্বাধীনতা। যাদের স্বাধীনতা নেই, তারাই শুধু জানে তাদের কী নেই। কাশ্মীরবাসী বা প্যালেস্টাইনীদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন— পরাধীন দেশে তাদের দিন কীভাবে আসে, রাত কীভাবে যায়?

[হায়দারাবাদের ট্র্যাজেডি ও আজকের বাংলাদেশ, লেখক : আরিফুল হক। প্রকাশক : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, চট্টগ্রাম-ঢাকা, প্রকাশকাল- ২০০১]

https://nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট—০৪

NEHRU'S 'WAR OR ACCESSION' THEORY

Aziz Razvi

War or Accession-the two words became the watch-word with the Nehru Government, the Prime Minister himself, his deputy Sardar Patel and the inimitable lower level functionary of the government, V. P. Menon, the Standstill Agreement, notwithstanding. While accession was anathema to the Nizam, Hyderabad's accession to India now became an obsession with the Indians, even if it had to be brought about by use of force.

The 'War or Accession' ultimatum by Prime Minister Nehru apparently upset Mountbatten who wanted an explanation from Nehru himself. And Nehru explained to his boss that he was as horrified as Mountbatten on reading the account of his speech in the newspapers and assured him that he was misreported and that he never mentioned the words 'war or accession', a typical Nehruvian prank to get out of trouble. His explanation: 'since he was speaking in Hindustani (The Indian National Language), the Madrasi stenographer who was recording his speech misunderstood him'. As Hodson remarks, 'the Madrasi stenographer does not make a convincing scapegoat'.[1] Nehru reveled in spontaneous utterances, his one-time admirer and the bitterest critic D. F. Karaka once remarked. They came from the heart and apparently circumvented the head.[2] 'War or Accession' was one such utterance directed towards the Nizam.

Mountbatten's express innocence and denial of any knowledge about India's military plan for the invasion of Hyderabad, was not a plausible deniability, to say the least. For a government to have plans of immense consequences on the table without the knowledge of Head of State is inconceivable in a democratic and secular set up, like the one Nehru claimed India to be.

---

[1] Hodson, *The Great Divide*, Page 491.

[2] D. F. Karaka, *The Lotus Eater from Kashmir*, 1952. Derek Verschoyle, London, Page 53.

https://nagorikpathagar.org

Mountbatten was also chairman of the Defence Committee of the Cabinet, 'and the prime mover in negotiations with Hyderabad'. Some of the British authors who have been witness to the transfer of power in India and have been associated with Mountbatten's Viceroyalty and have watched his great 'political skills' from a close range, tried to galvanize him at the expense of all other players in the Indian drama. Even his weaknesses are condoned. In the context of his ignorance about India's military plans to humble Hyderabad, he was described as just a constitutional Governor-General 'with no administrative responsibility, no department, no executive staff and, therefore, it is possible that certain decisions at ministerial, or even service level, may have been taken of which he was unaware and about which it was nobodz's explicit duty to inform him'.3 If this line of argument is to be accepted, the first constitutional Governor-General of India should have refrained from acting the way he did in Kashmir by sending hundreds of plane-loads of the Indian troops in the Muslim majority State of Kashmir ruled by a British-installed Hindu Raja, 'before he had actually signed the Instrument of Accession'. It was the first military occupation of a conquered land by the newly-independent democratic India headed by a British Governor-General and a royalty in his own right. Other military expeditions were to follow by the Nehru Government.

It is not possible for many in the Indo-Pakistan subcontinent who have closely watched Mountbatten's style of governance for a brief period as the last Viceroy and as the first Governor-General of India, to accept the popular notion that he was unaware of 'Operation Polo' plan of the government. In his dispatch to the King he pleads complete ignorance until such time a Lieutenant-General Goddard of the Southern-Command asks him 'What he thought of Operation Polo'. He sent for his Commander-in-Chief, General Bucher, who also expressed his complete ignorance. Eventually, it is Nehru, perhaps the architect of the plan in collaboration with Sardar Patel and V.P. Menon, who calms him down by stating that it is just a contingency plan to be executed 'in case a massacre of Hindus took place in Hyderabad in circumstances in which the Government of India could no longer

---

[3] Hodson, *The Great Divide*, Page 490.

https://nagorikpathagar.org

forebear from intervention' To an internationally-minded Nehru, Mountbatten explained what could be the repercussions within India and on international level.

Surprised at what he may have considered as naivete, Nehru 'undertook to take personal control of the situation and assured me there was nothing to worry about'.[4] Mountbatten greeted these comfortable words with scepticism, according to Ziegler. He even admonished Nehru for allowing his ministers to contemplate putting the plan into effect, and he himself took a very poor view of any such action whether or not there were any massacres. Nehru dismissed these fears as absurd–he would never be party to such a move.[5] How sincere was Nehru in assuring Mountbatten he would never be party to and how honest was Mountbatten in accepting them? The subse quent history of Hyderabad is a testimony to the actions of two architects of India's freedom.

A fairy tale as it may appear to be, in its contents and narra- tion, the Report to the King does not by any means absolve him of the responsibility of what took place six months after he left India and was no longer Governor-General. Nor does Ziegler's account of Mountbatten's admonition to Nehru and Nehru's effort to allay his fears of possible repercussions make a hero of Mountbatten or the standard bearer of justice and fairplay. In the entire scheme of things, Mountbatten appears to be the pivotal figure. This is borne out by the fact that he mentions to his friend Monckton in a des- perate mood and at an unguarded moment that he thought it best that negotiations should take place in August or September after he had left.[6] Why August or September when he was set to leave for home on June 21? Did he have a hunch or was he convinced under the influence of Nehru and the Congress leadership that the Hyderabad issue was politically intractable and needed a more drastic approach? Was he one with his ministers in thinking, come what may, that military action alone could bring Hyderabad to its knees? Did he

---

[4] Report of the Governor-General.

[5] Ziegler in *Mountbatten*, Page 454.

[6] Monckton Papers cited in Ziegler's *Mountbatten*.

https://nagorikpathagar.org

give any consideration to the message from the Nizam imploring him 'as a member of the Royal family of England' to help conclude a permanent settlement? The Hyderabad ruler's hopes soon proved to be over-sanguine as Mountbatten's own stat- ed and publicized pleadings with Nehru and Patel to 'adopt a more conciliatory approach' proved abortive.

The problem of Hyderabad compounded, in the meantime. Threats and intimidations became the order of the day. The Indian Prime Minister bluntly told the Nizam that an 'economic blockade and the tightening of the border' would result if the Hyderabad ruler did not sign the agreement, containing proposals amended by India, 'on the dotted line'.[7] His Deputy Prime Minister, Sardar Patel went a step further when he declared that 'if Hyderabad did not behave properly, it would go the way of Junagadh'. A settlement with the Nizam will have to be on the lines of the settlement with other states and that the 'terms of the talks with Lord Mountbatten have gone back with him'.[8] Again on July 26, 1948, Nehru was quoted by the Indian press as saying, 'if and when we consider it necessary, we shall have military operations against Hyderabad'.[9] This statement from the Prime Minister of India came a month after he had given assurances to Mountbatten that he would never be a party to any such move. Absurd, said Nehru when Mountbatten expressed the fear that his Ministers were seriously contemplating trying to put the plan (Operation Polo or military plan) into effect. Absurd, Nehru repeated, he would never be a party to such a move.[10]

This, like many other incidents, denotes the duality of Nehru's personality which could not be traced anywhere more than in his political ambitions. Perhaps no other politician of that time was better placed than Sheikh Mohammad Abdullah to assess the qualities of Nehru's personality. Enticed, loved, hated and ultimately jailed by Nehru, Abdullah was the man who helped Nehru bring

---

7 The Statesman of June 1948 as quoted by the Hyderabad Government Documents, *The Documents tell the Story*, printed in London, Page 29.

8 Daily News, July 16, 1948.

9 The Stalesman, July 26, 1948 as quoted in *The Documents tell the Story*, Page 30.

10 Ziegler, *Mouritbatten*, Page 454.

https://nagorikpathagar.org

Kashmir into the Indian fold and consolidate his position there by means not political, constitutional or democratic.

'The Lion of Kashmir' as he was known, Sheikh Abdullah sums up the qualities of Nehru's character in his autobiography. He says:

> Nehru's was a dual personality. Ideologically he was a democrat, enlightened, and considered himself an intellectual and an academic, with clear and visible leanings towards the left. He was close to Fabianism by conviction but admired Lenin's practical experiences. His idealistic mental make-up had produced in him a peculiar mixture of socialist values mixed up with democratic norms, thinly coated with a layer of Gandhian philosophy...
>
> Born with a silver spoon in his mouth in an environment which was aristocratic by all standards, Nehru had developed a taste for sycophancy and enjoyed it. And there was no dearth of sycophants who had surrounded him all his life. By nature he was dictatorial, intolerant and suffered from a deep sense of elitist morality. He disliked any difference of opinion with him. I have been witness to this aspect of his personality several times. Many others knew of this trait in his character, and avoided discussing controversial issues with him; much less expressing any difference of opinion.[11]

Sheikh Abdullah stopped short of calling him a hypocrite. And that is the tragedy of Nehru's greatness and his political excellence.

Sardar Vallabhai Patel, on the contrary, was a politician of a different mettle. He was not a hypocrite. He was honest and straightforward, sincere to his community and a great believer in the Chanakiyan philosophy of Hindu dominance. So was Nehru, but Nehru never translated his feelings into words on this issue. Sardar was outspoken and did not believe in beating about the bush. To the great sorrow and chagrin of Abul Kalam Azad who was President of the Indian National Congress during the critical Independence talks, Patel was the first and foremost supporter of the partition of the subcontinent into Hindu India and Muslim

---

[11] Sheikh Mohd Abdullah in *Atish-e-Chinar*, an autobiography in Urdu, published in Lahore in 1989.

https://nagorikpathagar.org

Pakistan.[12] He hated to see a grandiose Muslim presence in the Indian heartland in the shape of the Nizam's Dominion. Despite his promises to Mountbatten from his sick bed to arrive at a peaceful and honorable settlement with the Nizam, he did not wait for long for Mountbatten to leave the shores of India to fulfill his dreams.

Mountbatten's role in this Jekyll and Hyde drama was pivotal. As Crown Representative before independence and as the first British Governor-General of free India, his overwhelming desire to keep Hyderabad intact and its ruler in place, as claimed by Campbell-Johnson and many other British authors, was, according to these writers, frustrated by his own government before and after independence. Mountbatten admitted on more than one occasion as stated earlier that once he had the opportunity to talk to the Nizam face to face, many obstacles would be cleared and a way could be found to an amicable settlement. What stopped him, then, from a personal confrontation with the Nizam who had been visited before him by his predecessor Viceroys, Wavell, Linlithgow and Irwin? Perhaps, as Viceroy, and not as Crown Representative, his priority was British India, the growing political pressures from the two major political parties coupled with the British expediency to transfer power and get out of India retaining a loose Commonwealth link with that part of the world. No one, neither the Labor government in London nor their repre- sentative in New Delhi fully understood the complexities of Princely India.

Moral courage is the truest attribute of greatness, Mountbatten remarked while addressing the Pakistan Constituent Assembly on August 14, 1947. Wittingly or unwittingly he lacked that moral courage where it concerned Hyderabad. It is true that he did express a desire, once or twice to visit Hyderabad as India's Governor-General, but everytime his contention to do so was coun- tered with the argument by the Nehru Government that rather than go to Hyderabad, he should order the Nizam to be in Delhi for talks. And when he could not visit Hyderabad under Nehru's influ- ence more than any other member of his

---

[12] *India wins Freedom.*

https://nagorikpathagar.org

government, he sent a fairly low-level functionary of his own secretariat, his Public Relations Officer to Hyderabad for talks with the Nizam and his Government. What a fall! It could not be remedied until the last days of Hyderabad.

Whatever else he may or may not have done on political level except reporting back to his boss, it should go to the credit of Campbell-Johnson that he has made certain very positive remarks about men and matters in the State, about administrative machin- ery, about communal harmony and cultural synthesis and the diversity of views on the State's future and above all his assess- ment of the Nizam's political acumen which may not be complimen- tary but leaves one with the person's sound sense of judgement. While Campbell-Johnson's sense of judgement may be something to www.pathagar.com talk about, Mountbatten appeared to have completely lost sight of judgement, justice and fairplay during the final days of the Raj.

Azad, Mosley and Ayesha Jalal[13] hold Mountbatten responsible for his failure to protect the lives of millions of people in what was a mass cross migration ever known in history and for abdicating his duty as Viceroy in the wake of his decision on August 9 & 12, 1947 to withhold the announcement of Radcliffe Award until two days after August 15, India's Independence day. Added to this act of abandonment of his duty as the Viceroy, Mountbatten had allowed himself to play into the hands of Congress leadership in dealing with the native states. The smaller states in the north, Bhopal in Central India, others in Rajputana and Punjab posed little or no problems; even the sizable states of the south, Mysore and Travancore were forced to fall in line; Kashmir had already been grabbed in an unconstitutional and fraudulent manner and by the use of force. Hyderabad was the only stumbling block in the way of Nehru and Sardar Patel to eliminate any signs of Muslim presence in India and Mountbatten, one may add, unwittingly, if not know- ingly, helped them.

---

13 Azad, *India Wins Freedom*, Mosley, *The last days of British Raj*, page 286 (1961) and Ayesha Jalal's *The Sole Spokesman*, Page 293 and 296.

https://nagorikpathagar.org

Mir Laiq Ali, the last Prime Minister of Hyderabad was called by Mountbatten before he left India and was asked to advise the Nizam to sign the amended and final agreement before it was too late. Laiq Ali who knew the Nizam's mind and the factors that were working within the State replied with a fatalistic aplomb that the Nizam would rather be shot than surrender his independence. Mountbatten's last and final bid to capture or coerce the Nizam into submission also appeared to have failed. He retorted in a fit of rage... 'if Hyderabad was occupied by an armoured division, there would be very little shooting. It would be a bloodless victory (for the Indians) and the Nizam would die only if he choose to throw himself under a tank. More probably he would end up living in a small house in straitened circumstances'.[14]

Prophetic words. India did invade Hyderabad and occupied it. But it was not a bloodless victory, as prophesied by Mountbatten. Barring the city of Hyderabad, the State capital where the conqueror of the last citadel of Muslim imprint in India General Chaudhuri entered like Alexander, the Greek hero, followed by men of his armoured division, part of the artillery force with Indian Air Force planes hovering above and a corps of Indian correspondents in full army fatigues with war correspondents' badges tagged on their shoulders and sitting on the top of Indian tank–the rest of the State bathed in blood. And the Nizam did not throw himself under a tank, although a few hours before Chaudhuri's entry into the city, a plane was standing by to salvage him. He refused and lived till the last moments of his life in his own 'King Kothi' (Royal Palace) and not in a small house as predicted by the departing Governor-General. Indeed, as he foresaw, the Nizam lived the rest of his life in straitened circumstances. Mountbatten, before he left had cleared the way, in a very subtle manner, for Nehru and Patel to complete the task.

Sir Akbar Hyderi, a suave and capable Prime Minister of Hyderabad (1936-1941) was tired and disgusted with the State Congress attitude and their continued agitation in an otherwise peaceful and harmonious atmosphere. In a private letter to

---

[14] Governor-General's interviews No: 176, 25 May 1948 quoted by Ziegler in *Mountbatten*, Page 454.

https://nagorikpathagar.org

Walter Monckton he came out with his feelings and he had this to say...'the new India that is now emerging and may perhaps subsist for many years, until possible irretrievable damage has been done to Hyderabad, desired not cooperation but the destruction of Muslim India State.'

[Betrayal, A political study of British realations with the Nizams of Hyderabad by Aziz Razvi. Published by : South Asia Publications, Carachi.]

https://nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট—০৫

BEFORE THE SECURITY COUNCIL

Mir Laik Ali

Round One

There had been a good deal of activity in Paris on the morning of 17th of September (1948). The meeting of the Security Council after its session on the 16th had been provisionally fixed for the 20th of September, but in view of the rapidly deteriorating situation in Hyder- abad, Sir Alexander Cadogan had agreed to summon an urgent meeting, if possible, on the 17th evening and had assured that it will in any event be convened on the 18th morning. The question of a cease-fire resolution had been discussed with most members of the Council and appeared to have had the support of Sir Alexander Cadogan, the President of the Council and delegate for U.K., Dr. Jessop, delegate for U.S.A., Mr. Parodi (France), Mr. Arce (Argentine), General Mac Naughton (Canada), Mr. Azam (Syria) and Mr. Umana Bernal (Columbia); while the representatives of U.S.S.R. and Belgium appeared in no way opposed to it. If voting went, it looked like some seven to eight members voting in favour of the cease-fire resolu- tion and the rest abstaining.

Paris time is about five hours behind Indian time and the news of the surrender of Hyderabad on the afternoon of the 17th September reached Paris soon after midday there. That dampened all the enthusiasm of the members of the Council to convene an early meeting to discuss any cease-fire resolution. Thus, in the normal course, the meeting was held on the 20th September in a confused manner and then again on the 28th to hear the representatives of Hyderabad, and India. The cease-fire resolution or the merits of the case slipped into the back ground and attention was focussed on the issue whether the request of the Nizam for the withdrawal of the application of Hyderabad from the United Nations was genuine or made under duress.

https://nagorikpathagar.org

In the meantime, while the Indian armies of occupation maintained order in some form or other in the capital city of Hyderabad, the rest of the State, became one great expanse where murder, arson, loot and lawlessness held sway. After a general massacre by Indian armies in almost every place which they had visited in the beginning, atten- tion was focussed later on the Muslim community in every nook and corner of the State. In some places, wells were filled to brim by rotting corpses .Some of the missions which came over from India to see things for themselves were horrified at what they saw and felt ashamed at recording their observations. The conflagration had spread so far and wide and with such ferocity that even leaders of India had to publicly appeal to put a halt to the mass murder and arson and loot. The Security Council were apprised of the situation from time to time. The attitude of the Council is best outlined by the following excerpt from its own Official Report to the General Assembly of the United Nations:

Document A/495; Official Records.
Fourth session supplement No. 2 PP 32-37.

By a letter dated 21st August 1948 (S/986), the Secretary-General of the Hyderabad Department of External Affairs communicated to the President of the Security Council his Government's request that the grave dispute which had arisen between Hyderabad and India be brought to the Council's attention, in accordance with Article 35, paragraph 2, of the Charter. He said that, unless settled in accord- ance with international law and justice, the dispute was likely to en- danger the maintenance of international peace and security. The letter stated that Hyderabad had been exposed in recent months to violent intimidation, to threats of invasion and to economic blockade which were intended to coerce it into a renunciation of its independence. The action of India threatened the existence of Hyderabad, the peace of India and the entire Asiatic continent, and the principles of the United Nations. For the purposes of the dispute, the Government of Hyder- abad accepted the obligations of pacific settlement provided in the Charter.

https://nagorikpathagar.org

In a cablegram dated 13th September (S/1000) to the Secretary-General, the Secretary-General of the Hyderabad Department of External Affairs stated that Hyderabad was being invaded by Indian forces and that hostilities had broken out in various parts of the country.

The communication dated 21st August (S/986) from the Government of Hyderabad was included in the provisional agenda for the 357th meeting (16th September) together with communications requesting urgent consideration and reporting that hostilities had broken out. That was the first meeting after the Security Council's transfer from New York to Paris, and several representatives requested adjournment to permit receipt of instructions and the arrival of the regular representatives.

Following discussion, the Council rejected the proposal of the representative of China for adjournment until 20th September. The result of the vote was I in favour, with 10 abstentions.

A number of representatives then made the express reservation that adoption of the agenda would not, in any way, prejudge the competence of the Security Council or any of the merits of the case. No objection was made to these reservations, although the representative of China considered that admission of a question to the agenda might be held to imply a certain view of the Council's competence and juridical status of the parties.

After discussion, the agenda was adopted by 8 votes, with 3 abstentions.

The representative of HYDERABAD submitted that the situation demanded immediate action by the Security Council under Chapter VII of the Charter. His Government asked that the Council use its powers under the Charter to call a halt to the invasion and to bring about a withdrawal of the invading troops. Unless measures were taken immediately the world might be confronted with a fait accompli following the use of force. When those steps had been taken, he hoped that the Council would consider, investigate fully, and make recom- mendations upon the dispute between Hyderabad and India in relation to the situation as it existed when the dispute was first brought before the Council under Article 35, paragraph 2.

https://nagorikpathagar.org

The representative of Hyderabad then described the blockade and the other facts of the situation and said that it had been clear, from the outset, that the Indian Government's policy was intended to create on the borders of Hyderabad and India.pathagar.com a condition of confusion and disorder which would provide the aggressor with a plausible justification for what would be described as police action. Those plans had been made despite the fact that the Stand-still Agreement of 29 November 1947 between the two countries had expressly provided that nothing in it should give India the right to send in troops to assist in the maintenance of internal order.

Turning to the question of the independent status of Hyderabad he quoted an official statement made by the British Viceroy to the rulers and representatives of the Indian States on 25th July 1948, and reproduced in the White a Book on Indian States published by the Government of India, July 1948, to the effect that the Indian Independ- ence Act released the States from all their obligations to the Crown, and that the States had complete freedom and were technically and legally independent.

The Government of Hyderabad had offered, and he affirmed that offer, to submit the question of accession in matters of defence, external affairs and communications for determination by a plebiscite on the basis of adult suffrage under the supervision of the United Nations, provided that negotiations were resumed free of dictation, and that the conditions of freedom from outside interference and coercion were restored.

He then replied to the legal objections to the Council's competence based or the alleged-domestic jurisdiction of India in the matter, the international status of Hyderabad and the Stand-still Agreement. He maintained that, in fact, it had been India which had violated the Stand-still Agreement and had repeatedly refused to abide by the provision relating to the arbitration of disputes concerning the interpretation of the Agreement.

The representative of INDIA maintained that Hyderabad was not competent to bring any question before the Security Council; that it was not a State; that it was not, and never had been independent;

https://nagorikpathagar.org

the usefulness of the United Nations would be impaired and the cause of peace damaged if the provisions of the Charter were not respected and if parties which did not possess the characteristics of States were permitted to present their grievances before the Security Council. The account that had been given of his country's invasion of Hyderabad had no bearing on the application made by Hyderabad on 21st August. Therefore, the case which the Security Council should first consider was whether, on 21st August, Hyderabad had been competent to come before the Council. In due course, he should submit a detailed analysis of the situation to demonstrate that legally and politically Hyderabad could never be an independent territory.

Without going into the merits of the case, the representative of India indicated the events which had exhausted his Government's patience and finally had obliged it to take action. He referred to the heavy armaments in the possession of the Hyderabad Government and the depredations of the private armies which had been encouraged or countenanced by the Hyderabad Government.

At the 359th meeting (20th September), the representative of HYDERABAD said that no new instructions emanating directly from the Nizam had reached his delegation. However, he suggested that the discussion should be postponed for a few days, in view of the surrender of the Hyderabad forces and reports that Nizam had given instructions to the Hyderabad delegation not to press the complaint before the Security Council.

The representative of INDIA read a telegram from the Nizam to the President of the Hyderabad delegation, which had been transmitted by the Indian Agent General in Hyderabad, ordering the withdrawal of the Hyderabad case from the Security Council. The Indian Government stated emphatically that the action had been taken by the Nizam himself without India's request and before the Indian army had reached Hyderabad.

Indian troops had taken action to put an end to atrocities and border incidents and to prevent repercussions in the provinces adjoining Hyderabad and the rest of India. The ease with which the Indian forces had entered was an indicat of the overwhelming

https://nagorikpathagar.org

goodwill of the people of Hyderabad. In his opinion, the matter was concluded by the instructions which the Nizam had issued to the Hyderabad delegation.

The representative of the UNITED STATES OF AMERICA said that the use of force did not alter legal rights and the Government of India did not predicate any rights on the use of force. From that point of view, the situation had not been materially changed since the previous (357th) meeting. He felt sure that the parties would desire to keep the Council informed, and would supply detailed information.

He quoted a press report of a proclamation of the Indian Army Command to the people of Hyderabad stating that an opportunity would be given to them to decide their future internal government and relations with India. His Government had no doubt that the Government of India, in giving effect to that declaration, would have in mind that the Members of the Security Council and of the United Nations would watch development in Hyderabad with the hope and expectation that the outcome would demonstrate loyal support of the Principles of the Charter.

The representative of INDIA replied that his Government shared the deep regret for the use of force by any country on any occasion. He reiterated that force had been used in the present case only to maintain law and order, which had completely broken down in several parts of Hyderabad. He emphasised that his Government had repeatedly said that the will of the people would determine the relationship of Hyderabad with the Dominion of India and the form of Government which they wished for their own State. While maintaining the domestic character of the dispute, his delegation would be prepared to report in due course, to the Security Council. All details of the steps which his Government proposed to take to restore order and to ascertain and give effect to the will of the people of Hyderabad.

The representative of ARGENTINA expressed surprise at development in the Council. He considered that the representative of India had not demonstrated that the Council had no competence in the question and had not dealt with the merits

https://nagorikpathagar.org

of the case. He could believe the statements that the Nizam and his people were cooperating with the Indian army since a refusal to cooperate would have been difficult. He hoped that the question of Hyderabad would remain on the Council's agenda and that all members would be given an opportunity to discuss the substance of the matter.

The representative of COLUMBIA said that, if the State and Government of Hyderabad were to disappear, and if the Council found itself in a situation where the question could no longer be examined, his delegation would have to make a reservation based on two of the fundamental principles of the United Nations: the self-determination of peoples and the condemnation of any forcible acquisition of territory.

The representative of CANADA considered that the question of competence need not be further considered since the parties had undertaken to supply information to the Council. The representative of SYRIA said that the Security Council must keep the Hyderabad question on its agenda. He suggested the possibility of setting up an ad-hoc committee to study the problem.

In a cable dated 22nd September (S/1011), the Nizam of Hyderabad informed the Secretary-General that, on 13th September, he had sent a message to the representative of Hyderabad ordering him to withdraw Hyderabad's case from the Security Council. He had also asked his Agent General in New Delhi to communicate the order to that representative. To resolve all doubts in the matter, he formally requested the Security Council to note that he had withdrawn the complaint made by his Government to the Council. He added that the Ministry at whose instance the complaint had been made had resigned on 17th September, at which time he himself had personally assumed the charge of his State. The delegation to the Security Council which had been sent at the instance of that ministry, had ecased to have any authority to represent either him or his State. On 30th September, the Secretary-General received from the Nizam a letter confirming the cable.

https://nagorikpathagar.org

In a note dated 24th September (S/1015) to the President of the Security Council, the Hyderabad delegation stated that it viewed with satisfaction the attitude which the Council had adopted at the 359th meeting on 20th September. The Hyderabad delegation understood. the Council's view to be that the invasion of Hyderabad by India, having been on act of force, could confer no legal rights on India; than the Council had taken note of the declaration of the Indian representative that the sole purpose of the intervention of India had been to restore order and to create conditions for a free expression of the w of the people of Hyderabad; and that the Council retained the questic of Hyderabad on its agenda.

However, the events which had occurred since the Council's 359th meeting had shown that the Government of India and the Indian occupation authorities in Hyderabad were determined not to act in accordance with the declaration of the representative of India. Important constitutional and administrative changes had been introduced which were not related in any way to the avowed purpose of maintaining internal order. The Nizam had been compelled to surrender complete power to the Indian Military Commander. The principal admininistrative officers in most districts of Hyderabad had been removed. Instructions had been issued to the Hyderabad Agents General abroad to suspend their activities. In addition, there were reports, substantiated from Indian sources, that a regime of victimization and persecution had already begun.

The Hyderabad delegation stated that, in those circumstances it was imperative that a meeting of the Security Council be called to review the situation and prevent extension of the scope of the *fait accompli*. In view of the strict censorship and complete blackout of impartial news, it was suggested that the Counçil might find it desirable to appoint its own observers to keep itself informed of the trend of events in Hyderabad.

https://nagorikpathagar.org

Round Two

The third meeting of the Security Council to consider the Hyderabad case was held at Palais de Challiot in Paris on the 28th September 1948 when there was some discussion of the Hyderabad delegation's credentials and rights to future participation in view of the communication (S/1011) which had been received from the Nizam and the note (S/1015) from the Hyderabad delegation.

The representative of CHINA considered that the Hyderabad delegation should not be invited to the Council's table. The representative of COLUMBIA did not consider that the Council should reverse its decision with regard to the representatives of the two parties.

The representative of SYRIA argued that the Council should not base its actions on cablegrams which might not come from a truly authentic source. The Council, not being cognisant of conditions in Hyderabad, might request a representative or a member of the Coun- information on the cil to obtain the necessary in spot.

The representative of ARGENTINA said that, since the Indian Government had proclaimed martial law in the State of Hyderabad and had assumed civil and military control, he could not give credence to communications signed by the Nizam, so long as the Nizam did not before the Council. He considered that the Council appear person should request the Government of India to withdraw its troops from Hyderabad and to re-establish the normal Government, leaving any dispute to be settled by peaceful negotiations. The representative of Argentina said that he would not vote for the withdrawal of the item from the agenda.

The representative of COLUMBIA said that, since Hyderabad was under military occupation, the Council could not be certain that the Nizam had signed the letter of his own free will. He agreed with the suggestion of the representative of Syria that the Council should rely on its own sources of information.

https://nagorikpathagar.org

After further discussion, the Council accepted the suggestion of the President that it should hear the representative of Hyderabad on the question of credentials.

The representative of HYDERABAD said that a successful invader had withdrawn the credentials issued to his delegation by the lawful Government. He asked whether such a procedure was consistent with the authority and purpose of the United Nations. His delegation would leave to the Security Council the important decision concerning its status before the United Nations.

He declared that Hyderabad had been invaded not for the purpose of maintaining order, but as part of the plan of creating a unified India. There had been no disorders, communal strife or excesses in Hyderabad, even after the invasion had begun. Furthermore there was a profound difference between restoring order and the complete substitution of Indian authority for that of Hyderabad. He described the far-reaching administrative and constitutional changes which were being made and which amounted to annexation.

The representative of HYDERABAD said that the proposed plebiscite must not be a mockery under the pressure of Indian military power and imported administrators.

Regular constitutional Government must be restored, pending the establishment of international machinery for a plebiscite. Impartial observers must be appointed to report on the conditions and administration of the country, since it was clearly impossible for the Council to limit itself to information supplied by the Indian authorities alone. There was no reason why both parties should not, at that time, put forward constructive proposals for dealing with the entire situation, unhampered by the previous history of the negotiations. In that endeavour, they might well be aided by a member or by a committee of the Security Council.

The representative of INDIA said that the question of the genuineness of the credentials of the Hyderabad delegation might well have been examined at a much earlier stage. He quoted statements made by the Nizam and by Lord Mountbatten, the Governor-General of India, to show that the Government of

https://nagorikpathagar.org

Hyderabad had bear taken over through a *coup d'etat* by the extremist which had referred the matter to the Security Council. At that time, the Nizam had ceased to be a free agent and had come under the control of a group of extremists from whom he had recently been released.

Replying to allegations regarding censorship in Hyderabad, he said that all the normal functions of Government were being carried on by officers of the Hyderabad Government, although certain officers whose political contacts with the extremists had been proved had been dismissed. He pointed out that, as early as August 1947, the Indian Government had suggested a plebiscite on the issue of Hyderabad's accession, but the Hyderabad Government had rejected that proposal. The solution of the Hyderabad problem had established a new bond of friendship between Hindus and Muslims throughout India and Hyderabad. The Security Council should now consider whether the cause of peace would not be better served by dropping the matter from the agenda.

In a letter dated 11th October (S/1031) the Head of the Hyderabad delegation stated that, since the views of the delegation, on the validity of their credentials and cognate matters had alreadz been placed before the Security Council (360th meeting), he did not propose to ask that the delegation be represented at the next meeting of the council on the question.

In a letter dated 6th October 1948 (S/1027), the Minister for Foreign Affairs of Pakistan requested that Pakistan be permitted to participate in the discussion of the Hyderabad question in accordance with Article 31 of the Charter.

In another letter dated 20th November (S/1084), the Minister for Foreign Affairs of Pakistan stated that reports received since the date of his previous letter indicated that the situation in Hyderabad had con tinued to deteriorate and that urgent action by the Security Council was needed to remedy the situation. He therefore requested that the Council may deal with the Hyderabad question at an early date.

https://nagorikpathagar.org

The question was placed on the provisional agenda for the 38and meeting (25th November). Subsequently, the leader of the Indian delegation informed the President of the Council that the delegation which india had appointed to deal with the Hyderabad question had been withdrawn (S/1089). The Council postponed discussion of the question to its next meeting.

At the 383rd meeting (2nd December), the Assistant Secretary-General in charge of the Department of Security Council Affairs informed the Council, in reply to a query from the representative of Syria, that the delegation of India still had no duly qualified representative in Paris to participate in the discussion of the Hyderabad question.

By a letter dated 6th December (S/1109), the Minister for Foreign Affairs of Pakistan requested that a meeting of the Security Council be called as soon as possible.

By a letter dated 10th December (S/1115), the Government of India informed the Security Council that conditions in Hyderabad were peaceful and normal and that there was complete freedom of access by air, rail and road. In the circumstances, the Indian Government did not propose to send a representative to the Security Council to discuss the Hyderabad question.

In a letter dated 12th December (S/1118), the Head of the Hyderabad delegation said that it was now clear that the Nizam's alleged instructions for the withdrawal of the complaint had been given under duress and that he was virtually a prisoner of the Indian military authorities. Information in the possession of the Hyderabad delegation indi cated that the Nizam approved of the continued efforts to enlist the support of the United Nations. Accordingly, his delegation was reasserting its authority as originally appointed. Were that authority to be challenged, the Security Council would have to ascertain to what extent the Nizam had been a free agent. The situation also raised a question of law which could be properly answered by the Inter national Court of Justice. That question was to what extent the Security Council could consider as valid an order for the withdrawal of a complaint made by the Head of a State occupied by an aggressor.

https://nagorikpathagar.org

In a letter dated 13th December (S/1124), the representative of India transmitted to the President of the Security Council a brief factual report on the situation in Hyderabad. The report, made without prejudice to the question of the Council's competence, described the general conditions prevailing in Hyderabad, and, *inter alia*, developments in the administration, the State's financial and economic position, preparation for a Constituent Assembly and the status of the Nizam. The report quoted a statement by the Nizam that his subjects were settling down to normal life and that all shades of opinion in the State felt that the present administration was impartial and efficient.

At the 384th meeting on 15th December 1948, the representative of Pakistan was invited to participate in the discussion of the Hyderabad question. Further consideration was, however, postponed until after the Council's return to Lake Success.

https://nagorikpathagar.org

Round Three

The Government of Pakistan had hoped that in accordance with the decision taken at the meeting (384th) of the Security Council in Paris on the 15th December, 1948, the Secretariat would arrange for discussion of the Hyderabad question immediately after the Council returned to Lake Success early next year; but no such action was taken, and it was not until the Minister of Foreign Affairs of Pakistan, after having waited for over four months, requested for an early meeting of the Security Council through his letter dated the 4th May 1949, that a meeting was convened at New York to hear the representative of Pakistan on the Hyderabad situation.

At the 425th meeting (19th May), held at New York the representative of India re-counted the circumstances in which India had been forced to take action to put an end to the prolonged lawlessness and disorder which had been disturbing not only Hyderabad but also the adjoining districts of India. In particular he cited the case of Sidney Cotton, who had been convicted in a London court on charges of gun-running in Hyderabad, with the help of Pakistan officials. The military action had lasted only three or four days, because of the favourable attitude of the people. The Ministry at whose instance the complaint had been filed had resigned and the Nizam had formally withdrawn the case from the Security Council. He quoted statements of the Nizam denying allegations that he had acted under duress. With regard to the ministers who had been kept in power by a military organization known as the Razakars he quoted Lord Mountbatt's statement that they had taken office by engineering a coup. He also quoted various excerpts from a letter from Lord Mountbatten to the Nizam to the effect that those ministers had used coercive methods to prevent the carrying out of the Nizam's wishes thereby jeopardizing relations between India and Hyderabad. The ministers had also taken considerable liberties with State funds.

The action which India had been forced to take had not been directed against the people of Hyderabad or their ruler, but against the fascist clique which had usurped power and had been misusing it in a. manner that had threatened the tranquillity of

https://nagorikpathagar.org

India as well as Hyder abad. As soon as those men had resigned and the Nizam had assumed charge, he had withdrawn the complaint which they had made to the United Nations. The future of the State and its relationship with India were matters which had been left to be decided by the people. Arrangements for convening a Constituent Assembly for that purpose would be completed by the autumn.

The representative of INDIA made a detailed reply to the legal arguments which had been advanced in support of the view that Hyderabad was a State in international law and therefore capable of being a party to an international dispute and able to invoke Article 35, paragraph 2. In particular, he criticised the analogy that had been drawn between the international status of Hyderabad and that of the Republic of Indonesia. The Republic had been recognized de facto by a number of States, but no Government had ever recognized Hyderabad. Furthermore, Indonesia was not in the heart of the Netherlands as Hyderabad was in the heart of India. With the lesson of developments in Burma, India could not possibly agree to be dismembered by allowing any of the Indian States to claim international statehood. Hyderabad had never been a State in the sense of international law and it could never be one in the future if India was to live.

He said that conditions were settling down to normal and that the Nizam and his officers had been cooperating with the Indian authori ties for the restoration of law and order. Relations between the religious communities were cordial. There was no restriction on entry to Hyderabad, and press representatives from India and abroad had visited the State without hindrance. Any genuine grievances of the Muslims in any part of India could be voiced in the Indian Constituent Assembly, where they had adequate representation. The Indian Cabi- net contained seven Hindus, two Muslims, two Christians, two members of the Scheduled Castes and one Sikh.

In recent months, there had sprung up the salutary practice of conferences between India and Pakistan on such problems as rehabili- tation of refugees and treatment of minorities. Quite apart from the question of competence, if the Council desired information on any specific points, India would be able to supply

https://nagorikpathagar.org

it. Clearly, recurrent debates in the Council served no useful purpose and merely gave the opportunity for statements which disturbed India's internal tranquillity. In all these circumstances, he submitted that it was neither necessary nor desirable that the question be retained on the Council's agenda.

In reply, the representative of PAKISTAN maintained that India's action had been entirely unjustified and had constituted a breach of international peace, a threat to the maintenance of peace and a continuation of aggression which called for redress.

He described at length the historical position of Hyderabad, its relations with the United Kingdom, and the international status of the various Indian States after 15th August 1947, with a view to proving, that, at the termination of British rule, all those States had become independent unless they had signified a desire to accede either to India or to Pakistan. India had recognized that principle with regard to Jammu and Kashmir. It followed therefore that Hyderabad was independent. However, India was maintaining the view that the people of Hyderabad would be free to choose whether or not to accede to India, but that in either case, Hyderabad would have to hand over to India the conduct.of its foreign affairs. India had long contended that the dispute, if any, between Hyderabad and India was a domestic matter, but if Hyderabad had been independent before 12th September 1948, then the mere fact that its independence had been destroyed did not make the dispute a domestic matter for India.

With regard to the similarity between Indonesia and Hyderabad, he pointed out that, whereas the Netherlands could, perhaps with some plausibility, claim that Indonesia was still a Dutch colony, Hyderabad had a ruler and all the machinery of a State. After 15th August 1947, that State had been independent and its independence had been destroyed by military action on the part of India.

The representative of India had drawn the Council's attention to the fact that there were over thirty million Muslims in India and that no Government could afford to ill-treat so large a minority. However, earlier occurrences and incidents had created grave

https://nagorikpathagar.org

doubts in the minds of both Pakistani and Indian Muslims regarding the ability of the Government of India to safeguard that .ninority. In any event, the main question, was not the treatment of an Indian minority, but the problem of Hyderabad, which constituted a disturbing factor in the relations between India and Pakistan and subjected the Government of Pakistan to pressure from its own people for active intervention. The Government of Pakistan had had to exercise a great deal of res- traint in order to prevent action which might have destroyed the possibility of the continuation of peaceful relations between the two States. That was the principal reason why, on behalf of Pakistan, he had requested the Security Council, in Paris, to grant him a hearing on that problem.

Reviewing the development of the dispute, the representative of Pakistan said that the Nizam, on 11th June 1947 had issued a declara- tion to the effect that he had decided not to participate in the Consti- tuent Assembly of either Pakistan or India. On 9th July 1947, in a letter to the Crown Representative, the Nizam had requested that his State be accorded dominion status. At that time the Government of India had insisted on accession, whereas the Nizam, short of accession, had been willing to sign a treaty with India on the subjects of com- munications, defence and international affairs. Later on, it had been found necessary, pending a settlement, to agree upon a modus vivendi; that had been the Stand-still Agreement of 29th November 1947. That Agreement was to have remained in force for a period of one year, and disputes arising out of it were to have been referred to the arbitration of two arbitrators, one appointed by each of the parties, and an umpire appointed by those arbitrators. He then described the development of negotiations on the supply of arms and equipment. After examining the nature of the Indian blockade, he replied to the charges of gun-running.

Later, the Governor-General had suggested that, in order to satisfy public opinion in India, the Nizam should take steps to introduce a responsible government. The Nizam had not been unresponsive.

https://nagorikpathagar.org

As to the alleged breaches of the Stand-still Agreement, Hyderabad had suggested arbitration, as provided by the Agreement. India had replied, however, that consideration of the large number of points on which differences had emerged made it clear that arbitration would take up all that remained of the period of one year for which the Agreement was to last. The Indian answer had concluded that ference to arbitration could be regarded as a practical solution only if the Hyderabad Government would agree to take, immediately, certain steps which could be regarded as a genuine token of a desire to maintain cordial and friendly relations with the Government of India. The suggestions had been rejected. Since they would have meant that India would practically have run the Government of Hyderabad.

Continuing his statement at the 246th meeting (24th May) the representative of PAKISTAN recalled that, on 10th June 1948, the Director of the Information Bureau of the Nizam's Government had issued a press note to the effect that, in order to avoid the possibility of a clash with Indian forces, orders had been given that all Hyderabad troops should be withdrawn to a line three miles within the border. On 19th June, the Prime Minister of Hyderabad had made a complete review of relations with India. He had explained that, after protracted negotiations, the Government of India had made three alternative proposals; first, accession; second immediate responsible government on the lines determined by the Government of India; and third, decision of the issue of accession to India or independence by a plebiscite under neutral observation. With regard to the last alternative, the Nizam had agreed to a plebiscite under the general supervision of an independent international body. The Government of India had proposed, however, that during the interim period and pending the verdict of the people Hyderabad should accede in substance and should institute res ponsible government on the lines determined by India. At that stage, the Prime Minister of Hyderabad concluded, there had been no alternative but to reject the Indian proposals. Thereupon, the representative of Pakistan continued, negotiations had come to a standstill because there had been no further avenue to explore.

https://nagorikpathagar.org

The negotiations had showed that the Nizam had been willing to settle all matters in dispute by treaty, while the Indian Government had insisted on accession, which would have given the Indian Union the direct right to legislate for Hyderabad.

Then the military invasion had taken place, and after four or five days of bloodz struggle the resistance had been overcome by the heavily armed forces of India, supported by intense aerial bombing on more than twenty fronts. The Nizam had transferred full authority of Government to the military commander, and that military goverment had continued ever since.

During the military occupation, outstanding individual Muslims had been persecuted on the ground that almost a member of the Razakars organization, which had resisted the demand every one of them was for accession to India. With regard to the alleged *coup d'etat* of 27th October, 1947, he pointed out that, following some demonstrations in Hyderabad, the Prime Minister alone had resigned. Then the Government had been reconstituted with the majority of the ministers remaining. Later Mir Laik Ali had been called upon to take over the Prime Ministership and the Government had been enlarged. For the first time in the history of Hyderabad, seven out a total of twelve ministers had been elected representatives of the people. He cited instances to disprove the Indian representative's contention that Hyderabad was free from censorship and travel restrictions.

The representative of Pakistan suggested that if any doubt remained with regard to the Council's competence, an advisory opinion of the International Court of Justice should be obtained under Article 96. Meanwhile, provisional action should be taken under Article 40. to include arrangements for a general amnesty for the Razakars and other organisations. The ministers and other political leaders should be set free. Every type of persecution and discrimination should be stopped. If the Court was of the opinion that the Council was competent and the facts disclosed an unjustified aggression, the Council would have the duty of taking appropriate steps to restore the *status quo* as far as possible. If the Council was in any doubt on the matter, it had the means of ascertaining the facts for itself.

https://nagorikpathagar.org

Since the Government of India had frequently expressed its willingness to refer the matter to the people, he submitted that a plebiscite should be held under the guidance, supervision and control of the Security Council to settle the question of accession or independence.

He stressed his country's need and desire to live in friendly cooperation with India and appealed to the Council to take action as soon as possible to rectify a situation which caused unfriendliness between Muslims and Hindus and made it more difficult for the Governments of India and Pakistan to continue friendly relations.

When the representative of Pakistan had finished, a conspiracy of silence prevailed, and the meeting ended on an inconclusive note. Not a voice was raised to condemn the Indian aggression, or even to demand an inquiry into the real cts with a view to arriving at an cquitable solution of the problem. The Council shirked its duty to come to grips with the question of Indian aggression even though India had openly challenged not merely the prestige but the authority of the United Nations. The Security Council thus failed to provide protec- tion to a small state against the onslaught of its overwhelmingly bigger and stronger neighbour, and thereby encouraged India to plan and commit further aggressions. The solemn undertakings repeatedly given by India before the world body to determine the future status of Hyderabad in accordance with the will of the people have all gone over-board. Progressively, the State has been dismembered and the whole of it, in parts, has been annexed to the various provinces of India. The Nizam lives a virtual prisoner, stripped of all his authority and most of his belongings, counting the remaining days of his life but, the Security Council of the United Nations continues to remain seized of the Hyderabad question!!!

[Tragedy of Hyderabad by Mir Laik Ali, Published by: Pakistan Co-oparative Book Society Ltd., Carachi, 1962.]

https://nagorikpathagar.org

স্বাধীন হায়দারাবাদের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম নিজাম মীর কমরউদ্দিন খান আসফজাহ

https://nagorikpathagar.org

THE NIZAM'S DOMINIONS

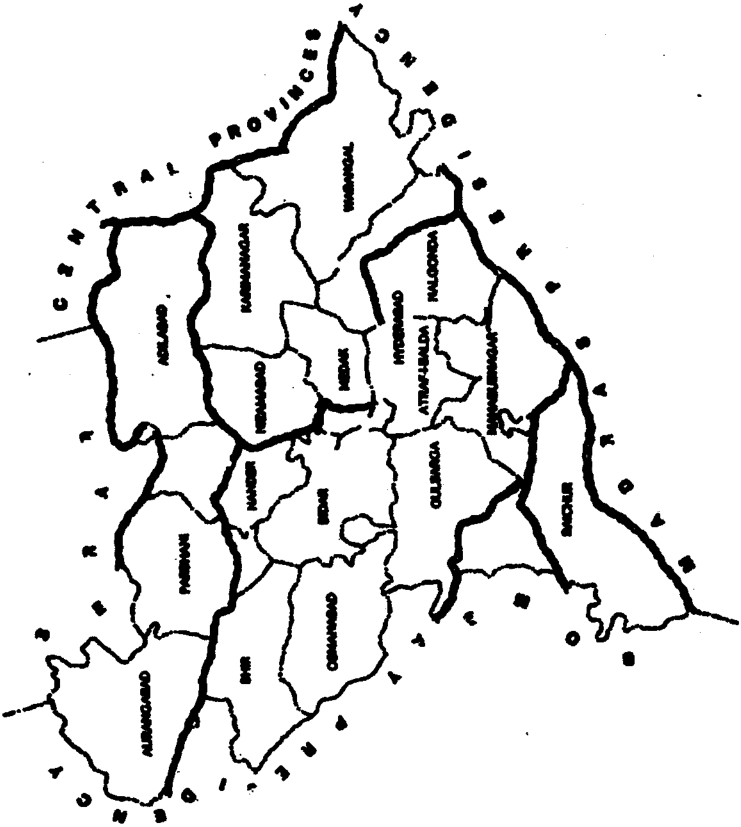

নিজাম শাসিত স্বাধীন হায়দ্রাবাদের মানচিত্র

https://nagorikpathagar.org

স্বাধীন হায়দারাবাদ শেষ নিজাম মীর ওসমান আলী খান ও তাঁর পারিষদবর্গ (তরবারি হাতে)

https://nagorikpathagar.org

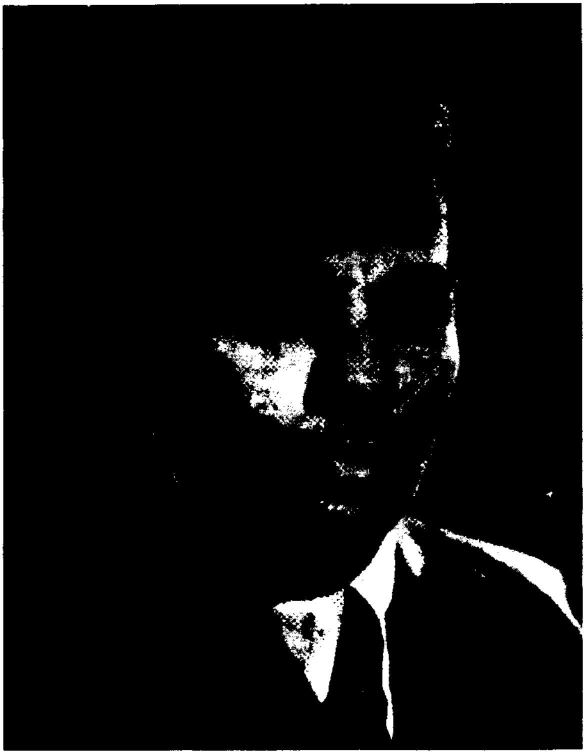

হায়দারাবাদের শেষ প্রধানমন্ত্রী লায়েক আলী

স্বাধীন হায়দারাবাদের জাতীয় পতাকা

https://nagorikpathagar.org

হায়দারাবাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর নায়ক কাশেম রিজভী

১৯৪৭ সালের হায়দারাবাদের মন্ত্রিসভা

https://nagorikpathagar.org

স্বাধীন হায়দারাবাদের জাতীয় সংসদ

হায়দারাবাদের রাজকীয় ল্যান্সার বাহিনী

https://nagorikpathagar.org

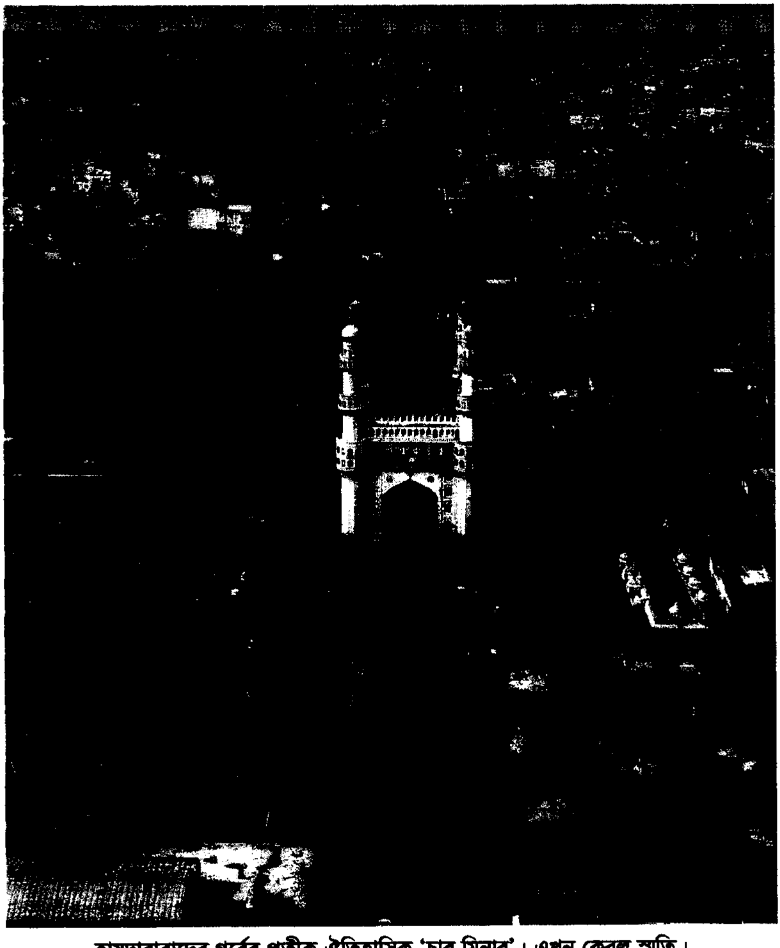

হায়দারাবাদের গর্বের প্রতীক ঐতিহাসিক 'চার মিনার'। এখন কেবল স্মৃতি।

https://nagorikpathagar.org

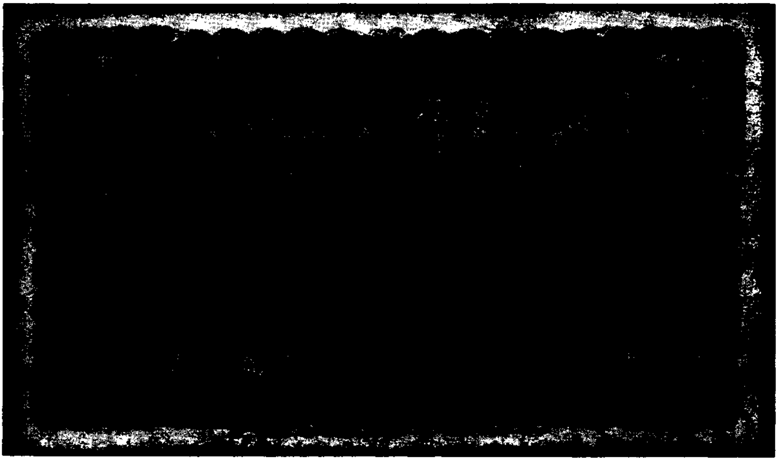

স্বাধীন হায়দারাবাদের একশত টাকার নোট (প্রথম অংশ)

স্বাধীন হায়দারাবাদের একশত টাকার নোট (দ্বিতীয় অংশ)

https://nagorikpathagar.org

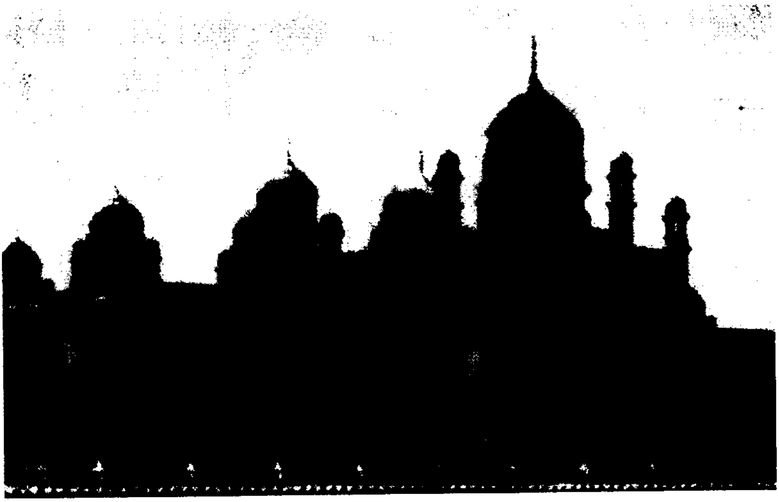

স্বাধীন হায়দারাবাদের হাইকোর্ট

জাতীয় প্রেসক্লাবে ১৯৯৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ভারত কর্তৃক হায়দারাবাদ দখলের ৫০তম বার্ষিকী স্মরণে জাতীয় আগ্রাসন প্রতিরোধ কমিটি আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন গ্রন্থকার আবদুল হাই শিকদার। ছবিতে (বাঁ থেকে) নাট্য ব্যক্তিত্ব আরিফুল হক, মাওলানা রুহুল আমিন, ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, রাজনীতিবিদ আনোয়ার জাহিদ, ড. মোহাম্মদ আবদুর রব, রাজনীতিবিদ শফিউল আলম প্রধান, জাতীয় অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান, ভাষা সৈনিক অলি আহাদ এবং কমিটির মহাসচিব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন।

https://nagorikpathagar.org

হায়দারাবাদের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি

হায়দারাবাদের রাষ্ট্রীয় আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম

https://nagorikpathagar.org

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস
02-57163214, 01710 197558
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com
9 789849 890089

https://nagorikpathagar.org